হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

পথের আলো

আশ্বিন * ১৪২১

একোনপঞ্চাশৎ বর্ষ * ষষ্ঠ সংখ্যা

বন্দে বন্দারুমন্দারং বৃন্দারকবিবন্দিতম্।
স্মেরাস্যং সুন্দরং সৌম্যং সীতারামং সনাতনম্॥
কৃষ্ণঃ করোতু কল্যাণং কংস-কুঞ্জর-কেশরী।
কালিন্দী-কলকল্লোল-কোলাহল-কুতূহলী॥

উপদেষ্টা মণ্ডলী

সংঘ আচার্য্য এবং সর্বাধীশ কিঙ্কর বিঠ্ঠল রামানুজ
সাহিত্যিক শ্রী সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

যুগ্ম-সম্পাদক

অধ্যাপক শ্রীরামরঞ্জন ভট্টাচার্য এবং
কিঙ্কর সামানন্দ

সহ-সম্পাদক

শ্রী সমীরণ মুখোপাধ্যায়

সঞ্চালক, বার্তা বিভাগ

কিঙ্কর প্রণবানন্দ

সঞ্চালক, উপায়ন বিভাগ

শ্রী তারকনাথ চট্টোপাধ্যায়

সঞ্চালক, শ্রীকোষ বিভাগ

শ্রী দীপক দেবনাথ

কর্মাধ্যক্ষ

শ্রী অরবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

মহামিলন মঠ

৭/৭, পি.ডব্লিউ.ডি. রোড, কোলকাতা - ১০৮
দূরভাষ ঃ ২৫৭৭ ৫১৭৯/২৮৭৩ ২৪৩৮
website : www.patheralo.org

সূ চী প ত্র

বারো টাকা মাত্র

সম্পাদকীয় * ২১২
শ্রীশ্রীচণ্ডী *
শ্রীশ্রীঠাকুর ২১৩
মন্মথ শ্রীজগন্নাথ *
কিঙ্করী যোগমায়া দেবী ২১৫
সীতারাম ও অবতারতত্ত্ব *
ডাঃ অর্ক ঘোষ ২১৭
যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ী সংবাদ *
দেবকুমার চক্রবর্তী ২২০
শ্রী দধীচি আশ্রমে শারদীয়া দুর্গোৎসব *
কিঙ্কর শরণানন্দ ২২৩
চৈতন্যজায়া শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী *
স্বামী চেতনানন্দ গিরি ২২৬
মহামিলন মঠে শ্রীশ্রীঠাকুরের লীলা প্রসঙ্গ *
হিমাংশু রায় ২২৯
শ্রী ভগবান সীতারামের সম্পত্তি লুট * **২৩১**
সংঘ সমাচার
নিখিলের আনন্দধারায় *
কিঙ্কর সমীরণ ২৩৩
কবিতা
গোপালবাড়ি *
কিঙ্করী স্নিগ্ধা সামন্ত ২৩৮
মায়েরা *
কিঙ্করী উমা ২৩৮
ওঙ্কারলোকে ''অনিলের ব্যাটা দিলীপ'' *
কিঙ্কর সমীরণ ২৩৯

প্রতি সংখ্যা ঃ বারো টাকা মাত্র *** বার্ষিক সডাক মূল্য ঃ একশো পঞ্চাশ টাকা মাত্র

সম্পাদকীয়

বছর ঘুরে দুর্গাপূজা এলো, গেলো। কতো আয়োজন, কতো বিজ্ঞাপন, রঙ্গবিরঙ্গ—কিছুই বাদ গেলো না; কিন্তু সত্যি সত্যি পুজো কি সেই অর্থে হল? প্যাণ্ডেল, আলোর রোশনাই আর নানা জাঁকজমকে লক্ষ্য যে পূজা—তা চাপা পড়ে প্রাধান্য পেল উপলক্ষ্য—উৎসব। আজকাল, আবার এক বিশেষ শ্রেণী 'পূজা' বলেন না, তাতে সাম্প্রদায়িকতা হবে! তাই বলা হয় 'শারদোৎসব।' যেন এক বিশেষ ঋতুকেন্দ্রিক আনন্দ মজলিস্ বৈ আর কিছু নয়। তাই 'জনসংযোগ'-এর ছদ্ম পরিচয়ে—পুজো মণ্ডপের পাশে অবলীলায় অবস্থান করে পুজো, দেবতা, ধর্মবিরোধী সাহিত্য সম্ভার!! কোন কোন ক্ষেত্রে পুজোর আয়োজকরা একধাপ এগিয়ে ব্যবস্থা করেন পুজো, ধর্মবিরোধী নানা আলোচনা চক্র ও কর্মশালা, যার একমাত্র লক্ষ্য হিন্দু সনাতন ধর্মের নিন্দা ও অসারতা নির্ণয় করা।

শ্রীশ্রীওঙ্কারনাথদেব এ যুগের মানুষকে তাই বললেন, ''ওরে আমার স্বরূপহারা জীব, তুমি এ উপাসনাতত্ত্ব বুঝিতে পারিতেছ না? তা পারিবে কেন? তুমি যে কলির জীব...ওরে আমার স্বরূপহারা জীব! তুই তো রাম। তোমার ব্রহ্মবিদ্যারূপিণী সীতাকে ইন্দ্রিয়রূপ দশমুখ বিশিষ্ট, মন-রাবণ হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে। বিনা শক্তি সাধনায় ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্যরূপ অকম্পন, প্রহস্ত প্রভৃতি রাক্ষসগণ ধ্বংস হইবে না, দৃশ্যরূপ সৈন্যগণ সহ মন-রাবণ মরিবে না। ...মায়া সমুদ্রে 'সদ্‌বৃত্তি' বানরগণের সাহায্যে নামের সেতুবন্ধন কর; 'প্রণবধনু' হস্তে রাবণকে আক্রমণ কর।''

আবার এই সমাজেই সংখ্যা কম হলেও এখনও যথার্থ ভক্ত আছেন। আছে চোখের জলে মায়ের পূজা। সেই পূজার প্রবর্ত্তক স্বয়ং শ্রীসীতারাম। তিনি কৃপা করে বিভিন্ন অঙ্গনে মাতৃরূপে আবির্ভূত হন আজও। এই নানা প্রতিকূলতার মুখোমুখি দাঁড়িয়েও তাই মাতৃপূজা ঠিকই হয়। মা আসেন, মা আসবেন—ঠাকুর মাকে চিরকাল এখানে আসার আমন্ত্রণ জানিয়ে রেখেছেন। তাঁর প্রায় সব আশ্রমে, ভক্ত, শিষ্য, সন্তানদের কৃতার্থ করে মা আজও আসেন। ঠাকুর বলেছেন—''তাপিত-তৃষিত পথিক! দুর্গম সংসারপথ ভ্রমণ করে বড় ক্লান্ত হয়েছ? এসো এসো নামকল্পতরুমূলে বিশ্রাম করবে এসো। ...সুখে দুঃখে বল দুর্গা দুর্গা দুর্গা।'' তিনি বন্ধুর মতো পাশে এসে বলছেন—''মা তো দূরে নাই ভাই। চরাচর অখিল ব্রহ্মাণ্ডে মা আমার ওতপ্রোতভাবে বিরাজমানা।'' তারপর একটি মৌলিক দৃষ্টি দিলেন—'মা আমার নির্গুণে পিতা, সগুণে মাতা।' ঠাকুর বলছেন—''মাতৃপূজার শ্রেষ্ঠ উপচার চোখের জল। চোখের জল মা আমার যেমন আদর করে গ্রহণ করেন, এমন কোন জিনিষ লন না।'' পূজার পরে মাকে বিজয়া করে এসে কলাপাতায় দুর্গা দুর্গা দুর্গা নাম লেখার ব্রত নেওয়ার উপদেশও তিনি দিয়েছেন, কারণ নামও যিনি দুর্গাও তিনি। তারপরে হল বিজয়ার প্রণাম। ঠাকুর শেখালেন নতুন তত্ত্ব ও পথ—''বুদ্ধিমান ব্যক্তি সহস্র, লক্ষ, কোটিবার প্রণাম করিবে, নমস্কাররূপ আত্মযজ্ঞের দ্বারা সমস্ত দেবতা তুষ্ট হন।'' তাঁর শিক্ষা অনুসরণ করলে মানুষ কৃতার্থ হবেই। ঠাকুরের কণ্ঠে আমরা ভক্ত উমাপদ-র গল্প শুনেছি। আর 'দিব্যজীবন'-এর ২৯ পৃষ্ঠায় ঠাকুরের মাতৃপূজার কাহিনী তাঁরাশঙ্কর ভট্টাচার্য্য লিখেছেন—অপূর্ব সেই সত্য ঘটনা আজ আবার মনন করা দরকার।

শ্রীশ্রীচণ্ডী

প্রণব-প্রেমামৃত ভাষ্য

শ্রীশ্রীঠাকুর

[শ্রীশ্রীঠাকুর রচিত চণ্ডী থেকে শ্রীশ্রীপ্রণব প্রেমামৃত ভাষ্যের শ্রীহস্ত লিখিত পাণ্ডুলিপিটি চতুর্থ অধ্যায় থেকে আমাদের হস্তগত হয়েছে। তাই এখান থেকেই পাঠকের কাছে গ্রন্থটি নিবেদন করা হল। চণ্ডীর এক থেকে তৃতীয় অধ্যায় পর্যন্ত শ্রীশ্রীঠাকুর লিখিত ও শ্রীগুরু প্রকাশন কর্তৃক প্রকাশিত পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ অনেকদিন পূর্বেই প্রকাশিত হয়েছে। মহামিলন মঠে পাওয়া যাচ্ছে। —সম্পাদক]

(পূর্বানুবৃত্তি)

অষ্টম অধ্যায়, রক্তবীজবধ

নখৈর্বিদারিতাংশ্চান্যান্ ভক্ষয়ন্তী মহাসুরান্।
নারসিংহী চচারাজৌ নাদপূর্ণদিগম্বরা ॥ ৩৭

অন্বয় ঃ নাদাপূর্ণ দিগম্বরা নারসিংহী (কেচিদ্ অসুরান্) নখৈঃ বিদারিতান্ কুর্ব্বতী অন্যান্ মহাসুরান্ ভক্ষয়ন্তী আজৌ চচার॥ ৩৭

বঙ্গানুবাদ ঃ সিংহনাদে দশদিক, আকাশমণ্ডল পরিপূরিত করিয়া নারসিংহী অসুরগণকে নখের দ্বারা বিদলিত করত অন্য মহাসুরগণকে ভক্ষণপূর্ব্বক রণে বিচরণ করিতে লাগিলেন॥ ৩৭

প্রণব-প্রেমামৃত ঃ নাদাপূর্ণ দিগম্বরা নাদৈঃ আপূর্ণানি সম্যক্ পূরিতানি দিশো অম্বরানি যয়া। নারসিংহী নৃসিংহশক্তিঃ কেচিদ্সুরান্ নখৈঃ নখরৈঃ বিদারিতান্ বিদলিতান্ কুর্ব্বতী অন্যান্ অপরান্ মহাসুরান্ মহাদৈত্যান্ ভক্ষয়ন্তী আজৌ যুদ্ধে চচার অচরৎ।

চণ্ডাট্টহাসৈরসুরাঃ শিবদূত্যভিদূষিতাঃ।
পেতুঃ পৃথিব্যাং পতিতাংস্তাংশ্চখাদাথ সা তদা ॥ ৩৮

অন্বয় ঃ কেচিদসুরাঃ চণ্ডাট্টহাসৈঃ শিবদূতযা অভিদূষিতাঃ পৃথিব্যাং পেতুঃ অথ তদা সা পতিতান্ চখাদ॥ ৩৮

বঙ্গানুবাদ ঃ কোন কোন অসুরেরা অত্যদ্ভুত মহাহাস্যের দ্বারা শিবদূতী কর্ত্তৃক হৃতপরাক্রম মূর্চ্ছিত হইয়া ধরাতলে পতিত হইল, অনন্তর সেই সময়ে দেবী পতিত তাহাদিগকে ভক্ষণ করিতে লাগিলেন॥ ৩৮

প্রণব-প্রেমামৃত ঃ কেচিদ্ অসুরাঃ দানবাঃ চণ্ডাট্টহাসৈঃ অত্যদ্ভুত মহাহাসৈঃ শিবদূত্যা দেবীশক্ত্যা অভিদূষিতাঃ হৃতপরাক্রমাঃ মূর্চ্ছিতাঃ সন্তঃ পৃথিব্যাং ধরণ্যাং পেতুঃ অপতন্ অথ অনন্তরং তদা তস্মিন্কালে সা শিবদূতী পতিতান্ অধোগতান্ চখাদ খাদিতবতী।

ইতি মাতৃগণং ক্রুদ্ধং মর্দ্দয়ন্তং মহাসুরান্।
দৃষ্ট্বাভ্যুপায়ৈর্বিবিধৈর্নেশুর্দেবারিসৈনিকাঃ ॥ ৩৯

অন্বয় ঃ ইতি বিবিধৈঃ অভ্যুপায়ৈঃ মহাসুরান্ মর্দ্দয়ন্তং ক্রুদ্ধং মাতৃগণং দৃষ্ট্বা দেবারি সৈনিকাঃ নেশুঃ॥ ৩৯

বঙ্গানুবাদ ঃ উক্তপ্রকার বিবিধ সংগ্রাম সাধনের দ্বারা মহাসুর-মর্দ্দনকারী ক্রুদ্ধ মাতৃগণকে দর্শন করিয়া অসুরসৈন্যগণ পলায়ন করিল॥ ৩৯

প্রণব-প্রেমামৃত ঃ ইতি উক্তপ্রকারেণ বিবিধৈঃ বহুপ্রকারৈঃ অভ্যুপায়ৈঃ সংগ্রামসাধনৈঃ মহাসুরান্ মহাদৈত্যান্ মর্দ্দয়ন্তং ক্রুদ্ধং কোপিতং মাতৃগণং মাতৃসমূহং দৃষ্ট্বা বিলোক্য দেবারি সৈনিকাঃ অসুরসেনাপতয়ঃ নেশুঃ পলায়িতবন্তঃ।

প্রশ্ন ঃ মাতৃগণ কাহারা?

উত্তর ঃ ব্রাহ্মী মাহেশ্বরী চৈব কৌমারী বৈষ্ণবী তথা।
বারাহী নারসিংহৈন্দ্রী চামুণ্ডা মাতরঃ স্মৃতাঃ।।

পলায়নপরান্ দৃষ্ট্বা দৈত্যান্ মাতৃগণার্দ্দিতান্।
যোদ্ধুমভ্যাযযৌ ক্রুদ্ধো রক্তবীজো মহাসুরঃ ॥ ৪০

অন্বয় ঃ মহাসুরঃ রক্তবীজঃ মাতৃগণার্দ্দিতান্ দৈত্যান্ পলায়নপরান্ দৃষ্ট্বা ক্রুদ্ধঃ যোদ্ধুং অভ্যাযযৌ॥ ৪০

বঙ্গানুবাদ ঃ মহাসুর রক্তবীজ মাতৃগণকর্ত্তৃক পীড়িত দৈত্যগণকে পলায়ন নিরত দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া যুদ্ধ করিবার জন্য উপস্থিত হইল॥ ৪০

প্রণব-প্রেমামৃত ঃ মহাসুরঃ মহাদৈত্যঃ রক্তবীজঃ রক্তং বীজং কারণং যস্য মাতৃ গণার্দ্দিতান্ মাতৃগণপীড়িতান্ দৈত্যান অসুরান্ পলায়নপরান্ পলায়ননিষ্ঠান্ দৃষ্ট্বা অবলোক্য ক্রুদ্ধঃ কোপিতঃ সন্ যোদ্ধুং যুদ্ধায় অভ্যাযযৌ আভিমুখ্যেনাগতবান্।

রক্তবিন্দুর্যদা ভূমৌ পতত্যস্য শরীরতঃ।
সমুৎপততি মেদিন্যাস্তৎপ্রমাণস্তদাসুরঃ॥ ৪১

অন্বয় ঃ যদা অস্য শরীরতঃ রক্তবিন্দুঃ ভূমৌ পততি তদা মেদিন্যাঃ তৎপ্রমাণঃ অসুরঃ সমুৎপততি॥ ৪১

বঙ্গানুবাদ ঃ যে সময় ইহার শরীর হইতে রক্তবিন্দু ভূমিতলে পতিত হইল তৎক্ষণাৎ মেদিনী হইতে তাদৃশ একটী অসুর উৎপন্ন হইল॥ ৪১

প্রণব-প্রেমামৃত ঃ যদা যস্মিন্‌কালে অস্য রক্তবীজস্য শরীরতঃ দেহাৎ রক্তবিন্দুঃ শোণিতকণঃ ভূমৌ পৃথিব্যাং পততি তদা তস্মিন্‌কালে মেদিন্যা ধরণ্যাঃ তৎপ্রমাণঃ তৎসদৃশঃ অসুরঃ দানবঃ সমুৎপততি সমুৎপন্নো ভবতি।

প্রশ্ন ঃ রক্তবীজের বিবরণ কি?

উত্তর ঃ গুপ্তবতী টীকাকার বলেন—

''ভাগিনেয়ো মহাবীর্য্যস্তয়োঃ শুম্ভনিশুম্ভয়োঃ।
ক্রোধবত্যাঃ সুতো জ্যেষ্ঠো মহাবলপরাক্রমঃ।।''

মহাবীর রক্তবীজ শুম্ভ ও নিশুম্ভের ভাগিনেয়। তাহার মাতার নাম ক্রোধবতী, সে জ্যেষ্ঠ পুত্র।

যযুধে স গদাপাণিরিন্দ্রশক্ত্যা মহাসুরঃ।
ততশ্চৈন্দ্রী স্ববজ্রেণ রক্তবীজমতাড়য়ৎ॥ ৪২

অন্বয় ঃ স মহাসুরঃ গদাপাণিঃ (সন্‌) ইন্দ্রশক্ত্যা (সহ) যযুধে ততঃ চ ঐন্দ্রী স্ববজ্রেন রক্তবীজং অতাড়য়ৎ॥ ৪২

বঙ্গানুবাদ ঃ সেই মহাসুর রক্তবীজ গদাগ্রহণ পূর্ব্বক ইন্দ্রশক্তির সহ যুদ্ধ করিতে লাগিল, অনন্তর ঐন্দ্রী স্বীয় বজ্রের দ্বারা রক্তবীজকে আঘাত করিলেন॥ ৪২

প্রণব-প্রেমামৃত ঃ স মহাসুরঃ মহাদৈত্যঃ গদাপাণিঃ গদাহস্তঃ সন্‌ ইন্দ্রশক্ত্যা ঐন্দ্র্যা সহ যযুধে ততঃ অনন্তরম্‌ চ ঐন্দ্রী ইন্দ্রশক্তিঃ স্ববজ্রেন অসাধারণকুলিশেন রক্তবীজং অতাড়য়ৎ তাড়িতবতী।

কুলিশেনাহতস্যাশু তস্য সুস্রাব শোণিতম্‌।
সমুত্তস্থুস্ততো যোধাস্তদ্রূপাস্তৎপরাক্রমাঃ॥ ৪৩

অন্বয় ঃ কুলিশেন আহতস্য তস্য শোণিতম্‌ আশু সুস্রাব ততঃ তদ্রূপাঃ তৎপরাক্রমাঃ যোধাঃ সমুত্ত স্থুঃ॥ ৪৩

বঙ্গানুবাদ ঃ বজ্রতাড়িত রক্তবীজের শীঘ্র শোণিতস্রাব হইতে লাগিল। সেই রক্ত হইতে তাহার ন্যায় আকৃতি ও পরাক্রমশালী যোদ্ধৃগণ উত্থিত হইল॥ ৪৩

প্রণব-প্রেমামৃত ঃ কুলিশেন বজ্রেণ আহতস্য তাড়িতস্য তস্য রক্তবীজস্য শোণিতম্‌ রক্তং আশু শীঘ্রং সুস্রাব স্রুত বৎ ততঃ শোণিতাৎ তদ্রূপাঃ রক্তবীজাকৃতিঃ তৎপরাক্রমাঃ তত্তল্যবলাঃ যোধাঃ যোদ্ধৃপুরুষাঃ সমুত্তস্থুঃ উত্থিতবন্তঃ।

যাবন্তঃ পতিতাস্তস্য শরীরাদ্রক্তবিন্দবঃ।
তাবন্তঃ পুরুষা জাতাস্তদ্‌বীর্য্যবলবিক্রমাঃ॥ ৪৪

অন্বয় ঃ তস্য শরীরাৎ যাবন্তঃ রক্তবিন্দবঃ পতিতাঃ তদ্‌বীর্য্যবলবিক্রমাঃ তাবন্তঃ পুরুষাঃ জাতাঃ॥ ৪৪

বঙ্গানুবাদ ঃ রক্তবীজের শরীর হইতে যত রক্তবিন্দু পতিত হইল তাহার ন্যায় ইন্দ্রিয়শক্তি, দেহশক্তি, উৎসাহ-সম্পন্ন তত সংখ্যক অসুরপুরুষ উৎপন্ন হইল॥ ৪৪

প্রণব-প্রেমামৃত ঃ তস্য রক্তবীজস্য শরীরাৎ দেহাৎ যাবন্তঃ রক্তবিন্দবঃ শোণিতকণাঃ পতিতাঃ নির্গতাঃ তাবন্তঃ তৎসংখ্যকাঃ তদ্‌বীর্য্যবলবিক্রমাঃ তস্যেব বীর্য্যং ইন্দ্রিয়শক্তিঃ, বলং দেহশক্তিঃ, বিক্রমো উৎসাহো যেষাং তে জাতাঃ উৎপন্নাঃ।

ক্রমশঃ

গুরুদেবের কৃপা ধন্যা

শ্রীমতী মিঠু চট্টোপাধ্যায়

খ্যাতনামা কীর্ত্তনীয়া

ঃ যোগাযোগ ঃ

উপেন ব্যানার্জী লেন, সাতঘাট
গোন্দলপাড়া, চন্দননগর, হুগলি
পিন- ৭১২১৩৭

ঃ দূরভাষ ঃ

(০৩৩) ২৬৮৩-২৯৪৭
৯৮৩১৫৮৪৭৯৩

মন্নাথ শ্রীজগন্নাথ

কি ঙ্ক রী যো গ মা য়া দে বী

''নমঃ নমঃ করুণাময় ভগবান আমারি।
চারিযুগে করুণা করে এ ভারতে অবতরি।
সাধুরে করিলে ত্রাণ, করিলে দুষ্টের দমন
ধর্মের গ্লানি মোছাতে জনম নিলে নারায়ণ।
ত্রেতায় এ ভারতে, রামরূপে এলে হরি।
শেখাতে ভারতে, পিতৃভক্তি প্রজানুরঞ্জন।
অসুর নাশিলে, করিলে রাবণ দমন,
মোদেরে করিতে ত্রাণ দাও প্রভু করুণাবারী॥
দ্বাপরে এ ভারতে কৃষ্ণরূপে অবতরি।
প্রেমের বন্যা, বহালে, সারা ভারত জুড়ি।
গীতামৃত বোঝালে পার্থে, কুরুক্ষেত্র রণোপরি,
সীতারামরূপে এলে ভারতভূমে বর্ণাশ্রম রক্ষা করি।
সাধারণজনে কৃপা করে করিলে কৃপা বন্টন।
নাম লয়ে থাক, হইবেরে অবশ্যই সাক্ষাৎ দর্শন
হে ভগবান তব মহিমায় ধন্য আমি, লহ প্রণাম আমারি॥''

নারায়ণ নানা অবতাররূপে ভারতভূমিতে অবতীর্ণ হয়েছেন অরিকে দমন করে শান্তি স্থাপনের জন্য। কখনো এসেছেন রামরূপে রাবণকে বধ করতে আবার কৃষ্ণরূপে কংসকে নিধন করতে এবং কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের মধ্যে দিয়ে ধর্ম স্থাপনা করতে। কিন্তু এরজন্য তাদেরকেও নানা দুঃখকষ্টকে স্বীকার করতে হয়েছে। তাঁরা মানুষের চেতনা আনতে এই কষ্টকে স্বীকার করেছেন। তবে তাঁরা যদি অসুর নিধন না করে বা অধর্ম নাশ না করতেন তবে মানুষের জীবনে আরও বিপর্যয় নেমে আসতো। কলিযুগে এই লীলাচিন্তা করে সহজে ভগবানের কাছে পৌঁছে যাওয়া যায়। আমরা যেমন সিনেমা দেখার পর তার কিছু কিছু ঘটনা মনকে আলোড়িত করে তেমনি ভাগবত রামায়ণের লীলাকথা পড়ার পর সেগুলোকে অনুরণিত করে লীলাময় হয়ে থাকতে হবে।

যেমন কারোর ঘরেতে হয়তো অনেক কিছু আছে সে সবকিছু সাজিয়ে রেখেছে আবার কারোর হয়ত অনেক না থাকলেও সামান্যকেই সুন্দর করে রেখেছে। অর্থাৎ মনকে সবার আগে সুন্দর করে তুলতে হবে। মনকে লীলাময় করে রাখতে হবে। বুঝতে হবে মন্দির, মসজিদ, গির্জা সব জায়গায় একই ঈশ্বরের বাস; সেখানে কোন প্রভেদ নেই তাই ঠাকুর বলতেন মন্দির, মসজিদ, গির্জা যেখানেই যাওনা কেন, সেখানে মাথা নত কর, প্রণাম কর। সব জায়গায় ঈশ্বরের বাস। ঠাকুর আরও বলতেন ঈশ্বর সর্বত্র বিরাজমান। সবার মধ্যে তিনি আছেন, 'সবার উপর মানুষ সত্য তাহার উপর নাই।' যেমন রামায়ণে চণ্ডালিনী শবরী ছিলেন রামভক্ত। তাই বৃদ্ধ বয়সে শ্রীরামচন্দ্রকে দর্শনের আশায়, তার আসার প্রতীক্ষায় সর্বদাই রাম নাম করতে করতে পথের শুকনো পাতা ঝাঁট দিতো। সে আশা তার পূরণ হলো। শ্রীরামচন্দ্র তাকে দর্শন দেবার পরই শবরী দেহত্যাগ করলো, তার মুক্তি হলো। সেবিকার আজ মনে পড়ে সেবিকার বাড়িতে সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের 'গুরুজী দাও দরশন' এই গানের রেকর্ডটি ছিল। এই গানটি সেবিকাকে খুবই আকর্ষণ করতো। আর একটা আশ্চর্য্যের ব্যাপার যখন ঠাকুরের জগন্নাথ নিবাসে আসার ব্যাপার থাকতো, ঠাকুরের দেরী হলেও এই গানটি শোনার কিছুক্ষণ পরেই তিনি চলে আসতেন, এ এক অভূতপূর্ব লীলা। এসব টুকরো টুকরো ঠাকুরের লীলাকথা আজও সেবিকাকে নাড়া দেয়।

এরকমই একটা ঘটনা। একদিন শ্রীশ্রীঠাকুর আসার কথা সেবিকার মনে হয়েছিল কিন্তু তখন তো ফোনের ব্যবস্থা ছিল না, যে ঠাকুর আসবেন কিনা জানা যাবে। কিন্তু সেবিকার মনে হতো যে ঠাকুর নিশ্চয়ই আসবেন

আর তার জন্যেই সমস্ত প্রস্তুত করে দেওয়া হতো। সেবিকার পাড়ার এক মা (লালুর মা) সেবিকাকে যোগাড় করার কাজে সাহায্য করতো। আর এদিকে ঠাকুরের সেবক (সেবিকার স্বামী) এ সমস্ত দেখে হাতে হাতে অনেক কড়াইশুটি ছাড়িয়ে রাখলো এবং আর কিছু করতে হবে কিনা জিজ্ঞাসা করলে সেবিকা তাকে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের শোবার ব্যবস্থা করতে বললেন কারণ শীতকালের রাত্রি; সেবিকার বাড়িতে আলু আর নীলমণির মায়ের দেওয়া ছাঁচি কুমড়ো ছাড়া কিছুই ছিল না। সেবিকা তাই দিয়েই নানারকম পদ করে ঠাকুরের জন্য অপেক্ষা করছিল এবং গাড়ির আওয়াজ হলেই লালুর মা ছুটে বারান্দায় দেখতে যাচ্ছিল। অবশেষে রাত্রি ১২টার সময় ঠাকুর তাঁর ছেলেদের নিয়ে এলেন। সবাইকে তখন লুচি ভেজে এসব খেতে দিলেন। এ যেন এক অভূতপূর্ব গুরুশিষ্যের টেলিপ্যাথি যোগ। যা অনুভবের মাধ্যমেই সম্ভব। করুণাময় করুণা না করলে কোন কিছু সম্ভব নয়। এরকমই আরেকটি লীলাকথা সেবিকার আজও মনে আছে।

একদিন ভোরবেলায় শ্রীশ্রীঠাকুর স্বপ্নে দেখালেন ছাপ্পান্ন ভোগ নেবেন, মথুরায় ছাপ্পান্ন ভোগ হয়, ঠাকুরের ছেলেরা সেই ভোগ খাবার কথা বলেছিল। যাইহোক সেবিকাও প্রস্তুত। কারণ সেবিকা যখন ঠাকুরের জন্য বড় কিছু ভোগের ব্যবস্থা করতো তখন ঠাকুরও তাকে সেই শক্তি যুগিয়ে দিতেন, নাহলে সেবিকার ক্ষমতা হতো না অতো রান্না করে পরিবেশন করা। এ গুরুকৃপা, সেই তা অনুভব করতে পারে। আমাদের দয়ালু ঠাকুর কৃপা করে তা করিয়ে নিয়েছিলেন। এই ছাপ্পান্ন ভোগের কথা লিখেছিলেন ঠাকুরের সারথী নিমাই (কিঙ্কর নিলয়ানন্দ)। এদিকে ঠাকুরের আসার কথা সকাল ১১টায়। কিন্তু তিনি ক্রমশই দেরী করছিলেন। নিমাইকে গাড়ি নিয়ে একবার ডুমুরদহ; সেখান থেকে আরেক জায়গায়, তারপর সেখান থেকে বাৎকুল্যা, যেখানে এক অতি দরিদ্র দম্পতি অনেকদিন ধরে ঠাকুরের প্রতীক্ষায় ছিল। আর এদিকে সেবিকা তিন-চারজন মায়েদের নিয়ে সমস্ত তরকারি কেটে ভোর রাত্রি থেকে ভোগের ব্যবস্থা করতে থাকে। ঠাকুর অন্তর্যামী তিনি জানেন ছাপান্ন ভোগের জন্য সময়ের প্রয়োজন; তাই তিনি বাৎকুল্যা থেকে ফেরার পথে মগরা রেলগেটে অনেকক্ষণ গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকার সময় শৌচে না গিয়ে যখন রেলগেট খুলে গেল, তখন শৌচে গেলেন। কারণ দয়াল ঠাকুর জানতেন এতে সেবিকাও সময় কিছু বেশি পাবে। নয়তো রান্না সব না হলে সেবিকা অপ্রস্তুতে পরে যাবে। যাইহোক ঠাকুর যখন জগন্নাথ নিবাসে পৌঁছালেন তখন সেবিকারও ছাপ্পান্ন ভোগ প্রস্তুত। শুধুমাত্র কিছু মালপো ভাজা বাকি ছিল। সমস্ত ঠাকুর সুন্দর করে করিয়ে নিয়ে উপস্থিত হলেন। তিনি তো দয়াময়। তাই তিনি সবসময় আমাদের শত অপরাধ ক্ষমা করে দিয়ে আমাদের দয়া করে যাচ্ছেন। রামায়ণে শ্রীরামচন্দ্র প্রজাদের কত দয়া করেছেন আর কলিযুগে আমাদের ঠাকুর তাঁর লীলার মাধ্যমে আমাদের সেই পথই দেখিয়ে দিয়েছেন। তাঁরা দয়া না করলে, তাঁরা কৃপা না করলে, তাঁরা করুণা না করলে আমরা খড়কুটোর মত ভেসে যেতাম। আজও ঠাকুর তাঁর সন্তানদের আগলে রেখেছেন কোলে করে নিয়ে। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত যেন তোমার সেই দয়াই পাই প্রভু, তোমার শ্রীচরণে এই আমাদের নিবেদন—

আঁধারে আলোকে সবার সুখে দুখে
বুকভরা ভালোবাসা নিয়ে নেয় টেনে বুকে,
সবার পাপটি নিয়ে, পাপীরে তরায়,
যে পাপী তরাবার তরে এসেছ ধরায়।
সংসার মাঝে পাই কতই যাতনা,
সে যে কাছে এসে ভুলায় সকল বেদনা
স্মরণ তোমার ভুলিনা যেন এই মোর প্রার্থনা
তব চরণে লহ হে প্রণাম মোদের সবার॥

সীতারাম ও অবতারতত্ত্ব

ডাঃ অর্ক ঘোষ

শ্রীশ্রীভগবান যখন মনুষ্যরূপে অবতীর্ণ হন, তখন তাঁর সবকিছুই ঠিক ঠিক মানুষের মত হয়। কারণ তাঁর লীলায় সব কিছুই নিখুঁত। তাঁর অপার্থিব দিব্যতনু এমনভাবে যোগমায়ার দ্বারা আবৃত থাকে যে সাধারণ জীব তাঁকে দেখেও চিনতে পারে না, শুনেও বুঝতে পারে না, জেনেও হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলতেন—'রাম যে পূর্ণব্রহ্ম পূর্ণ অবতার, তা বারজন ঋষি ছাড়া কেউ জানত না। আর সকলেই তাঁকে দশরথের বেটা বলেই জানত।' পরমহংসদেবের এই কথা স্মরণ করিয়ে শ্রীমন্ মাধব স্বামীজী ভাগবতের তত্ত্ব পরিবেশন করেছেন—'শ্রীভগবান মাতা দেবকীকে কারাগারে বলেছিলেন—

নান্যথা মদ্ভাবং জ্ঞানং মর্ত্যলিঙ্গেন জায়তে...

(শ্রীমদ্ভাগবৎ, ১০-৩-৪৪)

'তোমাদের আমার অপ্রাকৃত রূপ আমি যদি না দেখাই, মনুষ্যশরীর দেখে, আমাকে ঈশ্বর বলে কখনও বুঝতে পারবে না।'

তাই, তিনি যাকে কৃপা করে বুঝিয়ে দেন—সে শুধু চিনতে পারে, বুঝতে পারে, হৃদয়ঙ্গম করতে পারে। সেই কারণেই হয়তো, মহাপ্রভুর উৎকলের পঞ্চসখার অন্যতম ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা পুরুষ অচ্যুতানন্দ, প্রায় ৫০০ বছর আগে শ্রীশ্রীঠাকুর সীতারামদাস ওঙ্কারনাথের আবির্ভাবের নির্ভুল ভবিষ্যদ্বাণী করতে পেরেছিলেন। সীতারামের নাম, জন্মস্থান, রূপের বিবরণ, লীলার রূপরেখা উল্লেখ করে তিনি লিখেছেন—

'প্রভুক উদেকু থিকুসে চাহি,
প্রভু জনমিবে নরতনু বাহি।'

(ভক্তকুল! তোমরা প্রভুর সেই আবির্ভাবের জন্য অপেক্ষা করবে। শ্রীভগবান তাঁতে নরতনু নিয়ে জন্মগ্রহণ করবেন।)

'রাজসংহিতা' ও 'শূন্যসংহিতা'য় অচ্যুতানন্দজী শ্রীশ্রীঠাকুরের সম্বন্ধে যা লিপিবদ্ধ করে গেছেন, সেই সম্বন্ধে শ্রীমন্ মাধব স্বামীজী লিখেছেন—'এই হল আমাদের প্রভুর আবির্ভাবের পূর্বকথা—রাম না হতে রামায়ণ...এ যেন সেইরূপ। স্বল্প কথায় শ্রীশ্রীঠাকুরের সম্পূর্ণ জীবনী তাঁর ভবিষ্যদ্বাণীতে লিপিবদ্ধ। ...যা কারণরূপে নেই, তা কার্যরূপে হয় না...। ত্রিকালজ্ঞ অচ্যুতানন্দজী তাঁর সমাধিজ প্রজ্ঞায় যা দর্শন করেছিলেন, তাই লিপিবদ্ধ করে গেছেন। তাঁর এই ভবিষ্যদ্বাণী গাথা শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনীতে নতুন আলো প্রদান করে সকলকে মুগ্ধ করেছে।...'

এই কথার সূত্র ধরে একটা স্থির নির্ণয় করা যায়—পূর্ব লিখিত শাস্ত্রে অবতারের উল্লেখ বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। শাস্ত্রের কর্তা স্বয়ং ভগবান। বেদ, স্মৃতি, ভাগবৎ, পুরাণাদি গ্রন্থ, মহাপুরুষদের অনুভূত বাণীসমূহ—সব নিয়ে সনাতন ধর্মের শাস্ত্রসম্ভার—পরমজ্ঞানের নিত্য বিগ্রহস্বরূপ। এই শাস্ত্রে প্রভুর লীলার পূর্বাভাস থাকবে, সেটাই স্বাভাবিক, সেটাই লীলা আস্বাদনের একটা অপূর্ব সূত্র। অচ্যুতানন্দের ভবিষ্যদ্বাণী সেরকমই একটি অনবদ্য সূত্র। এছাড়াও ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে পঞ্চম অধ্যায়ে কলিযুগের যে পূজ্য রূপের কথা বলা হয়েছে, তার সাথে সীতারাম অবতারের অবর্ণনীয় সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। ভাগবতের এই অংশ বিস্তারিত আলোচনা করলে সীতারামের লীলা চিন্তন স্বতঃ উন্মোচিত হয়ে ওঠে—

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষা কৃষ্ণাং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্র পার্ষদম্।
যজ্ঞৈ সঙ্কীর্তন প্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধস।।

(শ্রীমদ্ভাগবৎ, ১১-৫-৩২)

(কলিযুগে ভগবানের শ্রীবিগ্রহ কৃষ্ণবর্ণ। তাঁর কৃষ্ণাঙ্গে অপূর্ব অঙ্গদ্যুতি। তিনি সাঙ্গোপাঙ্গ, অস্ত্র ও পার্ষদ সংযুক্ত থাকেন। বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ তাঁকে প্রধানতঃ সংকীর্তন যজ্ঞের দ্বারা আরাধনা করে থাকেন।)

এখানে, কলিযুগে ভগবানের আরাধ্য রূপকে কৃষ্ণাঙ্গ বলা হয়েছে। কয়েকজন ব্যাখ্যাকার 'কৃষ্ণবর্ণ' শব্দের অর্থ 'কৃষ্ণনাম উচ্চারক' বোঝাতে চেয়েছেন—সীতারামের রূপ তাঁদের নিকট সুবিদিত নয়, তাই তাঁদের এই প্রয়াস! কিন্তু এই শ্লোকের পূর্বে পরমপুরুষ ভগবানের চারযুগে চার আরাধ্য রূপের বর্ণনা দেওয়া আছে—তিনি সত্যযুগে শুক্লবর্ণ, ত্রেতাযুগে রক্তবর্ণ, দ্বাপরযুগে শ্যামবর্ণ ও কলিযুগে কৃষ্ণবর্ণ। তাই, এই শ্লোকে 'কৃষ্ণবর্ণ' বিশেষণের ব্যাখ্যা খুব স্পষ্ট—ভগবানের যে রূপ এখানে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, তাতে তাঁর কৃষ্ণাঙ্গ শ্রীবিগ্রহ! এতে কোন সংশয় থাকতেই পারে না। সীতারামের শ্রীবিগ্রহ কৃষ্ণাঙ্গ, দিব্যজ্যোতিতে তাঁর শ্রীতনু সর্বদাই উজ্জ্বল, তিনি ভক্ত শিষ্য ও পার্ষদ নিয়ে লীলা করেন, তাঁর হাতে ওঙ্কারদণ্ড (এবং দক্ষিণহস্তে শঙ্খ- চক্র-গদা-পদ্ম অস্ত্রের চিহ্ন), —হরিনাম সংকীর্তনকে প্রাধান্য দিয়ে নানাবিধ যজ্ঞের দ্বারা ভক্তগণ তাঁর অর্চনা করেন।

ভক্তমুখে শুনেছি—চারযুগের চার রূপের বিশেষত্ব আছে। প্রতি যুগেই একাধিক অবতার এসেছেন, কিন্তু এখানে কেবলমাত্র চারটি রূপের বিশেষ বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। সত্যযুগে শুক্লবর্ণ ভগবান যেন হংসবতারের প্রতিমূর্তি, ত্রেতায় তিনি রক্তবর্ণ/অগ্নিবর্ণ যজ্ঞভগবান, দ্বাপরে তিনি পীতাম্বর পরিহিত শ্যামবর্ণ শ্রীকৃষ্ণ, ও কলিতে তিনি কৃষ্ণাঙ্গ, সংকীর্তন প্রচারক মহাপুরুষ। ভগবানের এই চাররূপের বৈশিষ্ট্য হল—এই চাররূপে তিনি বিশেষভাবে জ্ঞানোপদেশ করেছেন ও যুগধর্ম সংস্থাপন করেছেন। হংসাবতারে তিনি সনকাদি মুনির প্রশ্নের উত্তর দিতে ব্রহ্মার সম্মুখে প্রকট হয়েছিলেন, ত্রেতায় যজ্ঞরূপ ধারণ করে যুগধর্মের উপদেশ দিয়েছিলেন, দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণ গীতার বাণী প্রকাশ করেছিলেন। সেইরকম কলিতেও সীতারাম শাস্ত্রমন্থন করে লিখিতভাবে শাস্ত্রের সারমর্ম পরিবেশন করেছেন ও কলিযুগধর্ম হরিনাম সংকীর্তন প্রচার করে জীবকুলকে উদ্ধার করেছেন।

ভাগবতের পরবর্তী শ্লোকে বলা আছে—

ধ্যেয়ং সদা পরিভবঘ্নমভীষ্ট দোহং
তীর্থাস্পদং শিববিরিঞ্চিনুতং শরণ্যম্।
ভৃত্যার্তিহং প্রণতপাল ভবাব্ধিপোতং
বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্॥

(ঐ ১১-৫-৩৩)

(বুদ্ধিমান ভক্তগণ এইভাবে ভগবানের স্তুতি করে—হে প্রভু! আপনার পাদপদ্মের ধ্যানে জাগতিক পরাভব দূরিভূত হয় ও ভক্তদের অভীষ্ট পূর্ণ হয়। আপনি সকল তীর্থের তীর্থস্বরূপ, শিবব্রহ্মাদি দেবগণ আপনার বন্দনা করেন। আপনি ভক্তদের আর্তি হরণ করেন, শরণাগতের রক্ষক ও ভবসাগর পারের তরণীস্বরূপ। হে মহাপুরুষ! আপনার পাদপদ্ম বন্দনা করি।)

---এই স্তুতিতে ভগবানের এই রূপকে 'মহাপুরুষ' বলে সম্বোধন করা হয়েছে। তাই কলিযুগের এই আরাধ্য রূপ কোন দেবকল্পিত মূর্তি নয়। ভগবান স্বয়ং 'মহাপুরুষ' রূপেই লীলা করবেন, সেই ইঙ্গিত সুস্পষ্টভাবেই লেখা আছে। ঠাকুরের চরণবন্দনাই কলিযুগের মূল উপাসনা, সেই সত্য শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত আছে।

শুধু যে ভাগবতে লেখা আছে, তাই নয়—এই স্তুতি ও ব্যাখ্যা আমাদের ঠাকুরের অনুমোদিত। 'লীলা অভিরাম' গ্রন্থের 'ওঙ্কারনাথ গীতা' অংশে শ্রী প্রমোদরঞ্জন গুপ্ত লিখেছেন—

''করজোড়ে প্রণাম করে স্তব করতে আরম্ভ করলাম ঃ

নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণ হিতায় চ
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ
ধ্যেয়ং সদা পরিভবঘ্নমভীষ্ট দোহং।
তীর্থাস্পদং শিববিরিঞ্চিনুতং শরণ্যম্
ভৃত্যার্তিহং প্রণতপাল ভবাব্ধি পোতং
বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্॥...

..তিনি প্রসন্ন হলেন, বললেন—'তোরা কি চাস্?'..."

প্রভুর বন্দনার পরবর্তী শ্লোকে বলা আছে—

ত্যক্ত্বা সুদুস্ত্যজ সুরেপ্সিত রাজ্যলক্ষ্মীং
ধর্মিষ্ঠ আর্যবচসা যদগাদরণ্যম্।
মায়ামৃগং দয়িতেপ্সিত মন্বধাবদ্
বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্॥

(প্রভু! আপনার পাদপদ্মের বর্ণনা কে করতে পারে? রামাবতারে পিতৃবচন রক্ষার্থে আপনার চরণ অরণ্যে ঘুরে বেরিয়েছে, প্রেয়সী সীতার ঈপ্সিত মায়ামৃগের দিকে আপনার চরণ ধাবমান হয়েছে। হে মহাপুরুষ! আপনার ঐ পাদপদ্মযুগলের বন্দনা করি।)

—এই শ্লোকের দুটি উল্লেখ্য দিক হল—ভগবানের রূপকে পুনরায় 'মহাপুরুষ' বলা হয়েছে এবং এই লীলাবিগ্রহের সাথে শ্রীরামচন্দ্রের প্রাসঙ্গিকতা স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছে। আমাদের প্রিয়তম শ্রীশ্রীঠাকুরের স্বরূপ হল 'রাম'। যৌবনে যখন ঠাকুরের শিবদর্শন হয়, তখন ঠাকুর শিবকে বলেন—'আমায় ইষ্টদর্শন করান'। তখন, শিবের বামস্কন্ধ থেকে জগন্মাতা প্রকট হয়ে ঠাকুরের সূক্ষ্মদেহ কোলে নিয়েছিলেন ও শিব নেচে নেচে রামনাম করেছিলেন। শ্রীমন্ মাধব স্বামীজী এই দিব্য ঘটনার ব্যাখ্যা দিয়েছেন—'আলাদাভাবে ইষ্টদর্শন না করিয়ে ভগবতী শ্রী প্রবোধের হৃদয়স্থিত জ্যোতির্ময় দেবতার সাক্ষাৎকার করিয়ে দিলেন। তাঁর ইষ্টদেবতা শ্রীরাম, আলাদা রামদর্শন হল না। এবং তিনি স্বয়ংই যে 'শ্রীরাম', এতে জগদ্গুরু তাই দেখালেন, বুঝিয়ে দিলেন। আরও বোঝালেন—শ্রীরামের গুরু ভগবান শিব এবং শিবের গুরু শ্রীরাম। তাই তো তিনি নেচে নেচে রাম রাম করে দেখালেন—রাম, তুমিই এইরূপে এবার দেহধারণ করেছ। এত সুস্পষ্টভাবে দেখালেন, বোঝালেন যে এর ভিতর বিতর্কের অবকাশ রইল না।'

প্রভুর রূপ ও স্তুতি বিবৃত করে শ্রীমদ্ভাগবৎ বলছেন—

এবং যুগানুরূপাভ্যাং ভগবান যুগবর্তিভিঃ।
মনুজৈরিজ্যতে রাজন্ শ্রেয়সামীশ্বরো হরিঃ॥
কলিং সভাজয়ন্ত্যার্যা গুণজ্ঞাঃ সারভাগিনঃ।
যত্র সংকীর্তনেনৈব সর্বঃ স্বার্থহভিলভ্যতে॥
ন হ্যতঃ পরমো লাভো দেহিনাং ভ্রাম্যতামিহ।
যতো বিন্দেত পরমাং শান্তিং নশ্যতি সংসৃতিঃ॥
(ঐ ১১-৫-৩৫, ৩৬, ৩৭)

(রাজন্! এইভাবে যুগে যুগে ভক্তগণ যুগানুরূপ নামরূপ সহযোগে বিভিন্ন উপায়ে ভগবানের উপাসনা করেন। এই তথ্য সন্দেহাতীত যে চতুর্বর্গ পুরুষার্থের অধিদেবতা স্বয়ং শ্রীহরি। গুণমুগ্ধ সারগ্রাহী শ্রেষ্ঠপুরুষগণ কলিযুগের প্রশংসা করেন, কারণ একমাত্র সংকীর্তনের দ্বারাই সর্বস্বার্থ প্রাপ্তি হয়ে থাকে। সংসার চক্রে বিচরণশীল জীবের পক্ষে সংকীর্তনের থেকে উৎকৃষ্ট কোন পরমলাভ নেই, কারণ এর দ্বারাই পরমশান্তি প্রাপ্ত হয় ও জন্মজন্মান্তরের যাতায়াতের নিবৃত্তি হয়।)

ভাগবতের এই বিবরণের সাথে আমাদের প্রিয়তম শ্রীশ্রীঠাকুরের লীলা ও বাণীর হুবহু মিল রয়েছে। এই শ্লোকগুলির মধ্যে সীতারামের স্বরূপ ও রূপের শ্রেষ্ঠত্ব অপূর্বভাবে বর্ণিত হয়েছে। আমরা যেন ভাগবতের পাতায় শ্রীশ্রীঠাকুরের অভয়বাণীর প্রতিধ্বনি শুনে কৃতার্থ হই ঃ

'আমাতে সম্ভব অসম্ভব কিছু কল্পনা করিস্ না—আমি মৃণালতন্তুতে হস্তীবন্ধন করতে পারি, গোষ্পদে পর্বত নিমজ্জিত করতে পারি। আমার গতি নির্ণয় করতে পারে, এমন শক্তি কারও নেই...।'

যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ী সংবাদ

দেবকুমার চক্রবর্তী

শ্রীশ্রীঠাকুর 'নামামৃত লহরী' পুস্তকের বিভিন্ন খণ্ডে নাম মাহাত্ম্যের কথা বর্ণনা করেছেন সত্য, কিন্তু এই নাম মাহাত্ম্যের কথা বলতে বলতে তিনি বারবার উপনিষদের কথায় চলে গিয়েছেন এবং ব্রহ্মজ্ঞানের গভীর তত্ত্ব বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। 'নামামৃত লহরী'র একাদশ প্রকরণের একবিংশ উচ্ছাসে যাজ্ঞবল্ক্য-মৈত্রেয়ী সংবাদ বর্ণনা করেছেন। বৃহদারণ্যক উপনিষদের দ্বিতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ ব্রাহ্মণে ও চতুর্থ অধ্যায়ের পঞ্চম ব্রাহ্মণে এই যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ী সংবাদ বর্ণিত হয়েছে।

মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের দুই পত্নী ছিলেন। কাত্যায়নী ও মৈত্রেয়ী। বৈদিক যুগের ঋষিরা চতুরাশ্রমের নিয়ম মেনে চলতেন। যখন সন্ন্যাস গ্রহণের সময় উপস্থিত হল, তখন মহর্ষি তাঁর স্ত্রীদের সম্পত্তির ভাগ বুঝিয়ে দিতে চাইলেন, যাতে তাঁর অনুপস্থিতিতে স্ত্রীদের সাংসারিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্যে কোন অভাব না হয়। প্রথমা কাত্যায়নী ছিলেন সাংসারিকতায় সন্তুষ্ট সাধারণ নারী। তিনি সাংসারিক সম্পত্তির ভাগ বুঝে নিয়ে খুবই সন্তুষ্ট হলেন। খুশী মনে স্বামীকে প্রণাম করে বিদায় দিয়ে বললেন—আপনার আশীর্বাদে আমার বাকী জীবন বেশ স্বচ্ছল ভাবেই চলবে। আমি খুবই সন্তুষ্ট।

তারপর তিনি কনিষ্ঠা মৈত্রেয়ীকে সম্পত্তির ভাগ বুঝিয়ে দিতে চাইলেন। তিনি বললেন এই সম্পত্তির দ্বারা তুমি কাত্যায়নীর উপর নির্ভরশীল না হয়ে স্বাধীনভাবে স্বচ্ছল জীবন যাপন করতে পারবে। মৈত্রেয়ী বললেন—এই যে সম্পত্তি আমায় দিচ্ছেন তার দ্বারা কি আমি অমৃতত্ত্ব লাভ করতে পারব? অমৃতত্ত্ব মানে ব্রহ্মজ্ঞান। মহর্ষি বললেন—বিত্তের দ্বারা অমৃত লাভ করা যায় না। সাংসারিক সুখ সুবিধা যা নিয়ে সাধারণ মানুষ সন্তুষ্ট থাকে, বিত্তের দ্বারা সে সবই লাভ করা যায়। অমৃতত্ত্ব কখনই লাভ করা যায় না। মৈত্রেয়ী বললেন—যার দ্বারা আমি অমৃতত্ত্ব লাভ করতে পারব না, তার দ্বারা আমি কি করব? 'যেনাহং নামৃতা স্যাম্, তেনাহং কিম্ কুর্য্যাম্।" যার দ্বারা আমি অমৃতা হতে পারব না, তা দিয়ে আমি কি করব? কেবলমাত্র সাংসারিক সুখ স্বাচ্ছন্দ আমার জীবনের কাম্য নয়।

এখনও আমরা মানুষের মনোবৃত্তিকে দুটি ভাগে ভাগ করতে পারি। একটি কাত্যায়নী বৃত্তি যাতে মানুষ সাধারণ সাংসারিকতায় সন্তুষ্ট থাকে। আর অপরটি মৈত্রেয়ী বৃত্তি যেখানে অল্প কিছু মানুষ সাধারণ সাংসারিকতার উর্দ্ধে অন্য কিছু মহত্তর বস্তুর সন্ধান করে না।

মৈত্রেয়ীর কথা শুনে যাজ্ঞবল্ক্য খুবই প্রীত হলেন। বললেন—তুমি সর্বদাই আমার খুবই প্রিয়। এখন তুমি যা প্রশ্ন করলে তার দ্বারা তুমি আমার প্রিয়তর হলে। তুমি আমার কাছে উপবেশন কর এবং নিবিষ্ট চিত্তে আমার উপদেশগুলি শোন ও ধ্যান কর।

যাজ্ঞবল্ক্য বললেন—'ন বা অরে পত্যু কামায় পতি প্রিয়র্ভবতি, আত্মনস্তু কামায় পতি প্রিয়র্ভবতি।' হে মৈত্রেয়ী পতির কামনায় পতি প্রিয় হয় না, আত্মার কামনাতেই পতি প্রিয় হয়। সাধারণভাবে এর অর্থ হয়, পতির কামনার জন্য নয়, নিজের কামনার জন্যই পতি স্ত্রীর প্রিয় হয়। লৌকিক অর্থে সাধারণভাবে ধরলে এ কথা সত্য। পতি স্ত্রীর ভরণ-পোষণ করেন, তার সকল কামনা পূর্ণ করেন, তাকে সন্তান উপহার দেন। সুতরাং স্ত্রীর নিজের প্রয়োজনেই পতি স্ত্রীর প্রিয় হন। এই আপাত সত্যটি কিন্তু পরিপূর্ণ সত্য নয়। আমরা এ বিষয়ে পরে আলোচনা করছি।

যাজ্ঞবল্ক্য বলেই চললেন—দেখ, জায়ার কামনায় জায়া পতির প্রিয় হয় না, আত্মার (নিজের) কামনাতেই জায়া পতির প্রিয় হয়। তেমনি পুত্রের কামনাতেই পুত্র পিতামাতার প্রিয় হয় না, আত্মার কামনাতেই পুত্র পিতামাতার প্রিয় হয়। আবার তিনি চেতন প্রাণী ছেড়ে অচেতন বস্তুর কথা বলছেন। তিনি বলছেন দেখ বিত্তের কামনায় বিত্ত মানুষের প্রিয় না, আত্মার কামনাতেই বিত্ত মানুষের প্রিয় হয়। সকল বস্তুর কামনায় সকল বস্তু মানুষের প্রিয় হয় না, আত্মার কামনাতেই সকল বস্তু মানুষের প্রিয় হয়। গৃহপালিত পশু ইত্যাদির কামনায় পশুবলি মানুষের প্রিয় হয় না আত্মার কামনাতেই পশুগুলি মানুষের প্রিয় হয়।

এবার যাজ্ঞবল্ক্য আরও বৃহত্তর ক্ষেত্রের কথা বললেন। তিনি বললেন ব্রাহ্মণের কামনায় ব্রাহ্মণ যজমানের প্রিয় হয় না। আত্মার কামনাতেই ব্রাহ্মণ যজমানের প্রিয় হয়। ক্ষত্রিয়ের কামনায় ক্ষত্রিয় সকলের প্রিয় হয় না, আত্মার কামনাতেই ক্ষত্রিয় সকলের প্রিয় হয়। দেবতাদের কামনায় দেবতারা সর্বসাধারণের প্রিয় হয় না, আত্মার কামনাতেই দেবতারা সকলের প্রিয় হয়। বেদগুলির কামনায় বেদ দ্বিজদের প্রিয় হয় না, আত্মার কামনাতেই বেদ দ্বিজদের প্রিয় হয়। সমস্ত কিছুর কামনায় সমস্ত কিছু সকলের প্রিয় হয় না, আত্মার কামনাতেই সমস্ত কিছু সকলের প্রিয় হয়।

যাজ্ঞবল্ক্য বললেন এই যে বারবার আত্মার কথা বলা হল, বিচার করে এই আত্মার প্রকৃত স্বরূপকে জানতে, শুনতে, উপলব্ধি করতে হবে। তাকে জানলে জানার আর কিছু বাকী থাকে না।

যখন স্ত্রী নিজের (আত্মার) ব্যক্তিগত সুখ সুবিধার জন্য পতিকে ভালবাসেন তখন তিনি প্রকৃত আত্মার একটি অতি ক্ষুদ্র অংশের কথা ভাবেন। তাই সেই সুখ সততই দুঃখ মিশ্রিত। প্রকৃত আত্মাকে জানলে উপলব্ধি হয় যে স্ত্রীর আত্মায় আর পতির আত্মায় কোন ভেদ নাই। দুই আত্মাই স্বরূপতঃ এক।

নিজের স্বার্থের কথা ভেবে পুত্রকে ভালবাসলে সে ভালবাসা ক্ষুদ্র স্বার্থের দ্বারা সীমায়িত সুখ দুঃখ মিশ্রিত ক্ষুদ্র ভালবাসা মাত্র। প্রকৃতপক্ষে একই আত্মা পিতামাতারূপে ও পুত্ররূপে বিরাজিত। তাদের মধ্যে কোন ভেদ নাই। এইভাবে আত্মাকে জানলে তার প্রকৃত স্বরূপ জানা যায় এবং পুত্রের প্রতি প্রকৃত প্রেমকে বুঝতে পারা যায়।

বিত্তের মধ্যে, গৃহপালিত পশুপক্ষীদের মধ্যে, সমস্ত কিছুর মধ্যে সেই একই আত্মা বিরাজিত। এই সর্বব্যাপী আত্মাকে দেখতে, জানতে ও নিদিধ্যাসনের দ্বারা উপলব্ধি করতে হবে। ''আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্য, মন্তব্যো, নিদিধ্যাসিতব্য।''

যাঁরা ব্রাহ্মণকে এই আত্মা থেকে পৃথক বলে মনে করেন, তাঁরা ব্রাহ্মণদের দ্বারা পরিত্যক্ত হন। যাঁরা ক্ষত্রিয়কে এই আত্মা হতে পৃথক বলে মনে করেন, তাঁরা ক্ষত্রিয়দের দ্বারা পরিত্যক্ত হন। যাঁরা দেবতাদেরকে এই আত্মা থেকে পৃথক বলে মনে করেন, দেবতারা তাঁদের পরিত্যগ করেন। যাঁরা সমস্ত বস্তুকে এই আত্মা থেকে পৃথক বলে মনে করেন, সমস্ত বস্তু তাদের পরিত্যাগ করেন।

আসলে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, সমস্ত দেবতা, জগতের সকল বস্তুই সেই একই আত্মা, তাকে ব্রহ্মই বলি বা অন্য যে কোন নামেই ডাকি না কেন।

যাজ্ঞবল্ক্য আরও বিশদভাবে বোঝাবার জন্য বললেন, বহুদূরে যখন কোন দুন্দুভি, শঙ্খ বা বীণা বাজতে তাকে তখন সেই সমস্ত শব্দের সুরের নানা বিচিত্রতা, ঝঙ্কার, তান, কর্তব ইত্যাদি আলাদা করে বোঝা যায় না, একটি শব্দ-সামান্য মাত্র বোঝা যায় না সমস্ত পরিবেশে পরিব্যপ্ত হয়ে রয়েছে। তেমনি একমাত্র ব্রহ্মই ব্রহ্মাণ্ডময় সমস্ত সৃষ্টিতে পরিব্যপ্ত হয়ে আছেন।

এই যে শব্দ-সামান্য এটিই সৃষ্টির প্রথম স্পন্দন। একে আমরা ওঙ্কারনাদ বলতে পারি। এই স্পন্দনই ক্রমে ঘনীভূত হয়ে ব্রহ্মাণ্ডময় নানা বস্তুজগত ও প্রাণী জগতে পরিণত হয়েছে।

যাজ্ঞবল্ক্য বললেন—দেখ, একটি ভিজে কাঠকে জ্বালালে যেমন তা থেকে নানা রকমের ধূম স্বতঃই নির্গত হতে থাকে, তেমনি সেই পরমব্রহ্ম (যাকে আত্মা

বলা হয়েছে) থেকে ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, ইতিহাস, পুরাণ, উপনিষদসমূহ নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের মত স্বতঃই উৎসারিত হচ্ছে।

পৃথিবীর সমস্ত জলরাশি যেমন সমুদ্রে এসে মিলিত হয়, তেমনি সমস্ত জ্ঞানেন্দ্রিয়ের (চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক) ও সমস্ত কর্মেন্দ্রিয়ের (হস্ত, পদ ও গুহ্যেন্দ্রিয়াদির) অনুভূতিগুলি সেই ব্রহ্মে এসে মিলিত হয়। কিংবা বলা যায় যে সেই ব্রহ্ম থেকেই সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলির অনুভূতি এমনকি মন বুদ্ধি ইত্যাদি সমস্ত কিছুর কার্য্যাবলী সেই ব্রহ্ম থেকেই উৎসারিত হচ্ছে এবং অন্তে তাতেই বিলীন হয়ে যাচ্ছে।

যেমন অগ্নি থেকে স্ফূলিঙ্গ নির্গত হয় তেমনি 'আমি' এই অহং জ্ঞানও তার থেকেই নির্গত হয় এবং তাকে স্বরূপতঃ জানতে পারলে তাতেই মিশে যায়।

এক খণ্ড লবণকে যদি একটি বৃহৎ জলপূর্ণ পাত্রে রাখা যায় তবে সেই লবণ জলের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে মিশে যায়। সেই লবণকে আর দেখা যায় না, পাত্রটিকে একটি পরিচ্ছন্ন জলের ভাণ্ডার বলেই মনে হয়। কিন্তু সেই জলের যে কোন অংশ থেকে জলের স্বাদ গ্রহণ করলে তা লবণাক্ত বলে মনে হয়। তেমনি একটি মিছরীর খণ্ড জলে রাখলে জলটির সমস্ত অংশই স্বাদু বলে মনে হয়। ঠিক তেমনিভাবে ব্রহ্ম সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে অনুসূত হয়ে রয়েছেন। আপাতদৃষ্টিতে তা বোঝা যায় না কিন্তু নিবিষ্টভাবে ধ্যান করলে ব্রহ্মাণ্ডময় সেই ব্রহ্মের অস্তিত্ব উপলব্ধি করা যায়। এই ব্রহ্ম আনন্দময়, আনন্দস্বরূপ। স্বাদু স্বাদু পদে পদে।

তখন মৈত্রেয়ী গভীরভাবে ধ্যান করে ভীত হয়ে পড়লেন। বললেন আপনার কথায় আমি বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছি। যখন 'আমি' এই জ্ঞান লুপ্ত হয়ে যাবে তখন আমি কি করে সেই আত্মাকে জানতে পারব। তখন আমি ত অজ্ঞান অবস্থা প্রাপ্ত হব।

মৈত্রেয়ীর এই কথায় যাজ্ঞবল্ক্য বললেন— মৈত্রেয়ী, তুমি ভীত হয়ো না। ভেবো না যে আমি তোমায় কোন মোহজনক কথা বলছি। যেখানে দুই-এর অনুভূতি থাকে সেখানে একে অপরকে দর্শন করে, একে অপরকে শ্রবণ করে, একে অপরকে অভ্যর্থনা করে, একজন অপরের কথা চিন্তা করে, একজন অপরকে জানে। কিন্তু যখন সবই আত্মা হয়ে যায়, তখন কে কাকে দেখবে, কে কাকে শ্রবণ করবে, কে কাকে অভ্যর্থনা করবে, কে কাকে জানতে পারবে? আসলে দুই বলে কিছু নেই, দুই-এর অনুভূতি একটি ভ্রান্তি দর্শন মাত্র। একমাত্র সর্বব্যাপী চৈতন্যই আছে, দুই বলে আর কিছু নেই। 'নেহ নানাস্তি কিঞ্চন।'

এই চরম সত্যকে জানা বড় কঠিন। সেটা এটা নয় ওটা নয় এইরকম ভাবে নেতি নেতি করে তাকে বোঝাবার চেষ্টা করা যায়। তিনি অচিন্ত্য, বুদ্ধি দিয়ে তাকে ধরা যায় না। তিনি অনাসক্ত, প্রকৃতির সঙ্গে তিনি মিলিত হন না। যিনি সব কিছুর জ্ঞাতা ও জ্ঞানস্বরূপ, তাকে কি দিয়ে জানবে? এটিই ঋষিদের চরম জ্ঞান। তুমি অমৃতত্ব লাভের কথা বলেছিলে, এর দ্বারাই তোমাকে সেই অমৃতত্ব লাভের চরম উপদেশ দেওয়া হল। এর ধ্যানেই তুমি কৃতার্থ হবে, অমৃতত্ব লাভ করবে। এই বলে যাজ্ঞবল্ক্য বিরত হলেন ও সন্ন্যাসের পথে অগ্রসর হলেন।

শ্রী দধীচি আশ্রমে শারদীয়া দুর্গোৎসব

কিঙ্কর শরণানন্দ

শ্রীশ্রীঠাকুরের শুভ উপস্থিতিতে শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা দেখবার সৌভাগ্য বহু জায়গায় হয়েছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—পুরীতে শ্রীনীলাচল আশ্রমে, দিল্লীর শ্রীদুর্গাপুরী আশ্রমে, হৃষিকেশ আশ্রমে, গুজরাটের শ্রী দধীচি আশ্রমে এবং দক্ষিণ ভারতের শ্রীরঙ্গমে শ্রীরেড্ডিয়ার ছত্রমে।

শ্রীশ্রীঠাকুরের চাতুর্মাস্যের বৈশিষ্ট্যই হল চারমাসের মধ্যে যে যে পূজাগুলি পড়ে সেই সব পূজাগুলি সাড়ম্বরে অনুষ্ঠান করা—যদিও ক্বচিৎ কখনো কোন বিশেষ কারণে তার ব্যতিক্রমও হয়েছে।

এখানে বলবো গুজরাটের দধীচি আশ্রমে শ্রীশ্রীদুর্গাপূজার (১৩৮৭) অনুষ্ঠানের কথা। চারিদিকে সাজসাজ রব! এই অঞ্চলে শারদীয়া দুর্গাপূজা বোধহয় এই প্রথম। গ্রামবাসীদের আনন্দের সীমা নেই। বাংলা থেকে দশভূজা মৃন্ময়ী মূর্ত্তি এসেছেন সুদূর গুজরাটের এই অখ্যাত দেবস্থলী গ্রামে। স্বয়ং মহেশ্বর-ই আয়োজন করছেন—মাহেশ্বরীর অর্চ্চনার।

পূজার প্যাণ্ডেল কোথায় হবে? উপযুক্ত জায়গা আশ্রম প্রাঙ্গণের সামনেই ডানদিকে পঞ্চপাণ্ডব শিবমন্দিরের সম্মুখে—যেখানে শ্রীশ্রীবাবা আগেই বসিয়েছেন অখণ্ড শ্রীনামমঞ্চ। বিশাল একটি বেদী—চারিদিকে ইঁট দিয়ে বাঁধানো। সেখানে চলছে শ্রীনাম। বাঁদিকে সুউচ্চ প্রাচীর ঘেরা শতাব্দী প্রাচীন শ্রীবটেশ্বর শিবমন্দির। দুর্গাপুজার জন্য উপযুক্ত জায়গা ঐ বেদীটিই। শ্রীশ্রীঠাকুরেরও তাই ইচ্ছা। কিন্তু কিছুদিন আগেই শোনা গেছে—ঐ বেদীর এককোণে স্থানীয় এক গৃহস্থ সাধুর (তিনি জাতিতে শূদ্র ছিলেন) সমাধি দেওয়া হয়েছিল (ভক্তগণ কর্তৃক) বহুপূর্বে। নিয়ম অনুযায়ী ঐ বেদীতে পূজাদি-দেবকার্য্য চলে না। তাই শ্রীশ্রীবাবা আগেই কলকাতার ভাট্‌পাড়ায় মহামহোপাধ্যায় ডঃ শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ মহাশয়ের কাছে টেলিগ্রাম পাঠিয়েছেন অশাস্ত্রীয়ভাবে দেহ সৎকার করার পর তার উদ্ধারের উপায় কি এবং সেই স্থান পবিত্র করার উপায় কি? —জানতে চেয়ে। উত্তর এসেছে—কঙ্কালসহ সেই স্থানের সমস্ত মাটি তুলে ফেলে অন্য স্থানে (যেখানে মানুষ বসবাস করে না) সমাধি দেওয়া এবং ঐ শূন্য স্থানে নতুন মাটি ভরাট করে একশত ঘড়া জল ঢালার পর সেই জল মাটি টেনে নিলে, সেখানে আগুন জ্বেলে, স-বৎস গাভী বেঁধে রাখা। গাভী প্রস্রাব পায়খানা করলে তবে সেই স্থান পবিত্র হয়।

এবার স্থানীয় মানুষের আবেগকে প্রাধান্য দিতে দু-একজন বয়োঃপ্রবীণ মানুষের সাথে আলোচনা করে শ্রীশ্রীঠাকুর প্রফুল্লদাকে (কিঙ্কর সারদানন্দজীকে) পাঠালেন কাঞ্চীকামপীঠের শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যজীর কাছে—সমাধিস্থ শূদ্রের কঙ্কাল তোলা হবে কিনা—জানবার জন্য। (শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যজী মহেসানার কাছাকাছি 'উঞ্ঝা'তে এসেছিলেন) প্রফুল্লদা রাত্রে ফিরে এসে জানালেন—তিনি জানিয়েছেন শ্রীশ্রীবাবার সিদ্ধান্তই সঠিক হবে।

পরেরদিন শুরু হল মিলিটারী তৎপরতায় খনন কার্য্য। সকাল থেকে লোক লাগিয়ে সন্ধ্যার পর সমস্ত কঙ্কাল উদ্ধার হল। একটি বস্তায় টুকরো টুকরো হাড়গুলি ভরে, মাথার খুলিটা বাবাকে দেখানো হলে, বাবা বললেন—''তোমার কোন চিন্তা নেই বাবা, তোমার ছেলে কিছু না করলেও আমরা তোমার উদ্ধারের ব্যবস্থা করবো।'' রাত্রি প্রায় ১১টা নাগাদ কয়েকটি হ্যাজাক্ জ্বেলে শ্রীনামের দলসহ শ্রীশ্রীঠাকুর আমার কাঁধে চেপে চললেন সরস্বতী নদীতীরে অনেকটা দূরে—সেখানে আগেই লোক পাঠিয়েছিলেন বড় গর্ত খুঁড়ে রাখার জন্য। ভক্তের মাথায় বাহিত সমস্ত কঙ্কালগুলি সেখানে সমাধিস্থ করে, মাটি

চাপা দিয়ে সকলে মিলে নাম করতে করতে (প্রায় ৩০।৪০জন) সরস্বতীতে স্নান করে ফিরে এলাম আশ্রমে। (সর্বক্ষণই নাম চলছিল)। শ্রীশ্রীঠাকুর স্বয়ং সমস্ত কার্য্যের তদারকি করলেন অতি সুষ্ঠুভাবে।

এদিকে সেই পুরানো সমাধি স্থানের প্রায় দেড়-মানুষ সমান মাটি গর্ত করে সেখানকার সমস্ত মাটি বাইরে ফেলে নুতন মাটি ভরা হয়েছে— শ্রীশ্রীবাবার নির্দেশে। শুধু তাই নয়, ভাট্‌পাড়ার পণ্ডিত মশাই-এর নির্দেশ মত ১০০ ঘড়া জল ঢেলে মাটি সমস্ত জল টেনে নেওয়ার পর সেখানে আগুন জ্বালা হল, পরে স-বৎস গাভী বেঁধে রাখা হল। পরেরদিন সকালে সেই গরু-বাছুর সরিয়ে পড়ে থাকা গোময়-গোমূত্রের সাহায্যে লেপনাদি করে দুর্গাপূজার উপযুক্ত পবিত্র স্থান তৈরী হল।

মা দুর্গাকে বসানো হল সেই বেদীতে। এমারজেন্সী তৎপরতায় তৈরী হল প্যাণ্ডেল। দেবদারু পাতা দিয়ে ঢাকা দেওয়া হয়েছে সমস্ত খুঁটিগুলি। লাল-নীল-হলুদ কাগজের মালা দিয়ে ভরিয়ে দেওয়া হল দুর্গামণ্ডপ থেকে গ্রামের মধ্যভাগ পর্যন্ত। মাইকে চলছে অখণ্ড শ্রীনাম। মাঝে মাঝে দেওয়া হচ্ছে—জয়ধ্বনি, মায়েদের উলুধ্বনি ও শঙ্খধ্বনি।

এরমধ্যে একজন কথা তুললেন—বাবা, যেদিকে কঙ্কাল সমাধিস্থ করা হয়েছে, সেইদিকে সকলে পায়খানা যায়। বাবা হাসতে হাসতে বললেন—''জানিস্, এক জ্যোতিষী কপাল দেখে বলতে পারতো তার কবে কি হবে, কবে কি ছিল ইত্যাদি। একদিন সে তার বাড়ীতে একটা মাথার খুলি এনে ঘরের টেবিলে রেখে কপাল দেখে কপালে লিখে রাখলো—

'ভোজনং যত্রতত্র, শয়নং হট্টমন্দিরে—
মরণং গোমতী তীরে, অপরং কিং ভবিষ্যতি।'

একসময় সে ঘরের বাইরে গেছে, এমন সময় তার স্ত্রী ঘরে এসে ঐ কঙ্কাল দেখে চিন্তা করলো, এটা নিশ্চয়ই তার স্বামীর কোন প্রণয়িণীর মাথার খুলি—তা না হলে এত যত্ন করে এটাকে নিয়ে এত কাণ্ড করবে কেন! এই ভেবে সে তখন মাথার খুলিটাকে ভেঙে গুড়ো করে পায়খানায় ফেলে দিয়ে এল। (অপরং কিং ভবিষ্যতি—শেষে কিনা সে পায়খানা প্রাপ্ত হল!)?

সপ্তমীর সকালে শ্রীশ্রীবাবা নিত্যপূজার ঠাকুর ঘরে এসে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন—'পুজো হয়ে গেছে কিনা? (নিত্যপূজা আমিই করি) কিছু খেয়ে নে, চণ্ডীপাঠ করবো, চশমা মুছিয়ে দিবি চল্।' দুর্গাপূজা মণ্ডপে শ্রীশ্রীবাবার আসন করে দিলাম—কিন্তু পাঠে বসে এমনই টান ধরলো (অন্তর্মুখী অবস্থা) যে পাঠ করতেই পারলেন না। অষ্টমীর দিন শ্রীশ্রীমায়ের কাছে বসে বাবা সমগ্র শ্রীশ্রীচণ্ডীটি পাঠ করলেন। মাঝে মাঝে চোখের জলে ঝাপ্‌সা হয়ে যাওয়া চশমাটি মুছিয়ে দেওয়া ছাড়াও অধ্যায় শেষে ঘণ্টা ও শঙ্খধ্বনি করতে লাগলাম। সমগ্র চণ্ডীপাঠটি 'টেপ রেকর্ডারে' তুলে রাখলাম—যা এখনও আমার কাছে রক্ষিত আছে। পাঠ শেষে বাবা স্বয়ং জয় দিলেন—'জয় শ্রীগুরু মহারাজ জীউকী জয়'---'জয় শ্রীপরিবারসমন্বিতা দুর্গামায়ীকি জয়'—'জয় শ্রীপার্বতীপতি বটেশ্বর জীউকী জয়'—'জয় শ্রীমহিষাসুরের জয়।'

মহিষাসুরের জয়? হ্যাঁ, শুধু মহিষাসুরের জয় কেন! মাঝে মাঝে বাবা জয় দেন—'ধর্ম কি—জয় হো। অধর্ম কি---জয় হো।' আবার কখনো কখনো জয় দিতে শুনেছি—কংগ্রেস কি জয় হো,—সিপিএম কি জয় হো—নকশাল কি জয় হো।'

কেন এরকম বৈসাদৃশ্য? না, অদ্বৈত পুরুষ শ্রীশ্রীবাবার কোন দ্বিতীয় ভেদ নেই—'অদ্বৈত পুরুষস্য ন দ্বিতীয়ো ভেদোঽস্তি'।

বোধনের দিন থেকে নবমী পর্যন্ত আশ্রমে যে কি মহানন্দে কেটেছে—তা শুধু অনুভবেরই ব্যাপার— লিখে বোঝানো সম্ভব নয়। সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী এই তিনদিনে স্থানীয় বাসিন্দারা যথাক্রমে 'অভিমন্যু বধ', 'মায়ের বোধন' এবং 'মহাত্মা রামপীর' নাটক দেখালেন তাঁদের ভাষায়। তাঁদের আনন্দের আর সীমা নেই---কারণ এরকম মহা-মহোৎসব তাঁদের জীবনে এই প্রথম, (বোধকরি সেই শেষও)।

ধীরে ধীরে দশমীর সন্ধ্যা নেমে এল। দেবস্থলী গ্রামের প্রান্তে অজ্ঞাত এক পুকুরের পাড়ে মায়ের বিসর্জন যাত্রা। সুসজ্জিত উটের গাড়ীতে চলেছেন শ্রীশ্রীমা দুর্গা, পিছনে গরুগাড়ীতে শ্রীশ্রীবাবাসহ আমরা। গ্রামের বহুলোক

স্ত্রী-পুরুষ, বালক-বালিকা, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা নির্বিশেষে মিছিলে যোগ দিলেন, সঙ্গে শ্রীনাম। ঢাক, ঢোল, শাঁখ বাজিয়ে মহা ধূমধামের সঙ্গে মায়ের বিসর্জন পর্ব সেরে সন্ধ্যার পর আমরা আশ্রমে ফিরে এলাম। শান্তিজলের পর প্রার্থনা, তারপর বাবার ছোট ভাষণ, সব শেষে লাইন দিয়ে বাবাকে প্রণাম ও মিষ্টান্ন বিতরণ। রাত্রে শ্রীশ্রীবাবা আমাদের সকলের উদ্দেশ্যে লিখলেন—

ঁশ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

শ্রীশ্রীবটেশ্বর শিব মন্দির
শ্রী দধীচি আশ্রম
২।৭।১৩৮৭

শ্রীশ্রীগুরু বিগ্রহেষু,

মার করুণাধারায় স্নাত হবে। আনন্দময় হতে এ ভূতসকল জন্মাল। 'আমি বহু হব' এই ইচ্ছা জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে যেমন জ্বলন্ত আগুন থেকে ফিন্‌কি ছোটে তেমনি কোটি সূর্য্যসম জ্যোতির্ম্ময় কেশাগ্রের শতভাগের শতভাগের একভাগের ন্যায় আত্মা আবির্ভূত হলেন। যন্ত্রিণী পরমাণুরূপিণী প্রকৃতিকে নিয়ে লীলা আরম্ভ হল।

কারণ-সূক্ষ্ম-স্থূল দেহত্রয়ে নিজেকে আচ্ছাদিত করত চললো লীলা অভিনয়, ভুল ভুল খেলার প্রধানা সহচরী অনাদি অবিদ্যা 'আমি দেহ'—এই বুদ্ধি। 'দেহাত্মদৃষ্টয়ো মূঢ়া নাস্তিকাঃ পশুবুদ্ধয়ঃ। স এব গোখরঃ।'

যারা দেহকে আমি মনে করে তারা মূঢ় নাস্তিক, পশুবুদ্ধি, গাধা। মাগো, এই গর্দ্দভত্ব মোচন করে জ্ঞান দিবার জন্যই বছর বছর আসিস্, দে মা তোর সন্তানগণকে জানিয়ে দে—তারা তোরই অংশ, তুই সব সেজে লীলা কচ্ছিস্।

সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরী নারায়ণি নমোঽস্তুতে॥

মায়েদের প্রতি লিখলেন—

শ্রীগুরু তনুষু—

মার বিজয়ার করুণাধারায়
স্নাতা হবে সবে।
দিবস রজনী মার নাম লয়ে
আনন্দেতে রবে॥
মাতাই বিশ্ব মাতা জীবদল
মাতাই সব হয়।
নামে প্রণামে মাতাতে ডুবিয়ে
হ'মা মাতৃময়॥

—শ্রীশ্রীগুরুদেবের
সীতারাম

পরের দিন ৩রা কার্ত্তিক (২০-১০-৮০) শ্রীশ্রীবাবা সহ আমরা রওয়ানা হলাম রাজধানী দিল্লীতে শ্রীশ্রীপরমগুরুমাতাকেঁ বিজয়া বিহিত প্রণাম করতে। ট্রেনে প্রচণ্ড ভীড়, অন্য যাত্রীরা আমাদের রিজার্ভেশন করা সীট দখল করে বাবার কাছে বসলে আমরা তাদের তুলতে গেলে বাবা আমাদের বাধা দিয়ে বললেন—'ওদের তুলছিস্ কেন, ওরাও তো আমাদেরই লোক।' (অদ্বৈত পুরুষস্য ন দ্বিতীয়ো ভেদোঽস্তি) আমাদেরই অপরাধীর মতো সীটের কোণে পাছা ঠেকিয়ে কোনরকমে কষ্ট করে যেতে হল। (ভোগের মিষ্টি থেকে পিঁপড়ে ছাড়াতে গেলে বলেন—'ওরা ডাল-ভাত- তরকারী খায় না, একটু সন্দেশ খায়—তাও তোরা ওদের খেতে দিবি না?' আবার কখনো বা গা থেকে কাঠ-পিঁপড়ে ঝেড়ে ফেলতে গেলে বলেন—'আমাদের পিঁপড়ে আমাকে কামড়াবে তা তোদের কি?')

৪ঠা সন্ধ্যায় দিল্লী পৌঁছালাম। শ্রীশ্রীপরমগুরুমা হরিদ্বার গিয়েছেন। ৫ই রাত্রে তিনি এলেন দিল্লীতে। শ্রীশ্রীবাবা ও তাঁর শুভ উপস্থিতিতে ৬ই কার্ত্তিক দুর্গাপুরী আশ্রমে শ্রীশ্রীকোজাগরী লক্ষ্মীপূজা এবং শ্রীশ্রীসত্যনারায়ণ পূজা সুসম্পন্ন হল। ৭ই বিকেলে পরমগুরুমাকে স্টেশনে তুলে দিয়ে এসে (তিনি বাংলা যাবেন) সন্ধ্যার পর রওয়ানা হলেন হৃষিকেশের উদ্দেশ্যে, রাত্রি ১২টায় আমরা হৃষিকেশ আশ্রমে পৌঁছালাম।

॥ জয়গুরু ॥

চৈতন্যজায়া শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী

স্বা মী চে ত না ন ন্দ গি রি

কলিযুগের অবতার, বৈষ্ণব ধর্মের প্রচারক, পতিত-পাবনী, সুপণ্ডিত শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব হয় নবদ্বীপে ইংরাজী ১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথিতে। চৈতন্যদেব তাঁর সন্ন্যাস নাম, পূর্বনাম বিশ্বম্ভর মিশ্র এবং বহুলোকে তাঁকে 'গোরা' বলেও ডাকতেন কারণ দেহের রং ছিল কাঞ্চণবর্ণ। প্রথমপক্ষের স্ত্রী শ্রীমতী লক্ষ্মীপ্রিয়াদেবী অল্পবয়সে দেহ রাখায় তাঁর মাতা শচীদেবী প্রায় জোর করেই দ্বিতীয়বার বিশ্বম্ভরকে বিবাহ দেন অত্যন্ত সুলক্ষণা, সুন্দরী নবদ্বীপ বাসিনী বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর সঙ্গে।

বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর পিতার নাম সনাতন মিশ্র, তিনি নবদ্বীপে সর্বজনপূজ্য—কারণ তিনি ছিলেন রাজপণ্ডিত, দানশীল, উদারস্বভাব, বিষ্ণুভক্ত এবং সমৃদ্ধ সম্পন্ন। বিষ্ণুপ্রিয়ার মাতার নাম শ্রীমতী মহামায়াদেবী। তাঁদের একমাত্র কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী, যিনি রূপে গুণে অতীব লক্ষ্মী ছিলেন। ছোটবেলা থেকেই বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী অত্যন্ত বুদ্ধিমতী, ভক্তিমতী, দেব-দ্বিজে তাঁর ছিল অত্যন্ত ভক্তি। বিষ্ণুদেবতার সেবাতেই তিনি সর্বদা ব্যাপৃত থাকতেন। তিনি যখনই গঙ্গাস্নানে যেতেন, নিমাই-মাতা শচীদেবীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ ঘটতো। শচীদেবীকে দেখলেই তিনি তাঁর পদধূলি গ্রহণ করে সর্বদা তাঁর কাছে কাছে থাকার চেষ্টা করতেন। শচীদেবীও বিষ্ণুপ্রিয়াকে তাঁর যোগ্য পতিলাভ হয়, এই আশীর্বাদ করতেন কিন্তু একটা ক্ষীণ আশা শচীদেবীর অন্তরে বিরাজ করতো, যাতে তিনি বিষ্ণুপ্রিয়াকে পুত্রবধূরূপে (নিমাই-পত্নী) পেতে পারেন।

সুপণ্ডিত নিমাই যখন পূর্ববঙ্গে ভ্রমণ করছিলেন, প্রথম পত্নী লক্ষ্মীপ্রিয়াদেবীর অন্তর্ধান হয়। নিমাই পণ্ডিত শৈশব থেকেই বিদ্যারসে মগ্ন থাকতেন। পূর্ববঙ্গে যথেষ্ট প্রসিদ্ধি লাভ করে, তিনি নবদ্বীপে ফিরে আসেন। লক্ষ্মীদেবীর অবর্তমানে শচীমাতার গৃহশূন্য, তিনি পুনর্বার তাঁর গৃহে লক্ষ্মীকে আনার জন্য দ্বিতীয়বার নিমাইয়ের বিবাহের চেষ্টা করতে লাগলেন। নিমাই-এর রূপ ছিল কাঞ্চনবর্ণ, দীর্ঘাঙ্গী, আনত নেত্র—এত সুন্দর নিমাই-এর জন্য পাত্রী হওয়া চাই উপযুক্তা, অত্যন্ত গুণী, শচীমাতা দীর্ঘদিন ধরে বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন—রূপে, গুণে, শিক্ষায়, দেব-দ্বিজে, ভক্তিতে তিনি নিমাই-এর যোগ্য ছিলেন।

একদিন শচীমাতা তাঁর চিন্তাকে বাস্তবে রূপ দেবার জন্য বিষ্ণুপ্রিয়ার পিতা সু-পণ্ডিত কাশীনাথ মিশ্রকে নিজবাড়ীতে ডাকাইয়া আনিয়া বিষ্ণুপ্রিয়াকে পুত্রবধূরূপে পাওয়ার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। সনাতন মিশ্র নিমাই-পণ্ডিতকে জানতেন—তাই শচীমাতার এই সুন্দর প্রস্তাবে তিনি রাজী হলেন এবং নিজকন্যা বিষ্ণুপ্রিয়াকে নিমাই-এর হাতে সমর্পণ করতে রাজী হলেন। নিমাই-এর পাণ্ডিত্য শুধু নবদ্বীপে নয়, নবদ্বীপের বাইরে ছড়িয়ে পড়েছে। এরকম সু-পাত্রকে কাশীনাথ মিশ্র হাতছাড়া করতে চাইলেন না। উভয়পক্ষ থেকেই বিবাহের আয়োজন চলতে লাগলো।

বিবাহের ঘটাও কম ছিল না। নিমাই-এর পিতা জগন্নাথ মিশ্রের প্রতিবেশী ধনী বুদ্ধিমন্ত খান, এই বিবাহের উদ্যোগে মেতে উঠলেন। বিবাহের প্রায় সমস্ত খরচ তিনি দিতে রাজী হলেন, কারণ তাঁর মতে রাজকুমারের (নিমাই) বিবাহ অত্যন্ত জাঁকজমকভাবে হওয়া উচিত। অত্যন্ত জাঁকজমকসহ নিমাই-বিষ্ণুপ্রিয়ার বিবাহ সম্পন্ন হল। এবার নিমাই গৃহে ফিরলেন—

'তবে আই পতিব্রতাগণ, সঙ্গে লইয়া
পুত্রবধূ ঘরে আনিলেন হর্ষ হইয়া
গৃহে আসি বসিলেন, লক্ষ্মী-নারায়ণ
জয়ধ্বনিময় হইল সকল ভবন॥

বিবাহের কিছু পরেই পিতৃশ্রাদ্ধ করার জন্য নিমাইপণ্ডিত গয়াধামে গেলেন এবং তথায় নারায়ণের পাদপদ্ম দেকে এত মুগ্ধ হলেন যে পিতৃশ্রাদ্ধ সমাপন করে নবদ্বীপের গৃহে ফিরলেন এক নতুন মানুষ হয়ে। তাঁর মন সম্পূর্ণ উদাস, বিদ্যার অহঙ্কারের লেশমাত্র নেই, মুখমণ্ডল শান্ত, উজ্জ্বল, ব্যবহারে অত্যন্ত ধীর—এ যেন অন্য নিমাই। শচীমাতাদেবী নিমাইকে 'চিরজীবি হও' বলে আশীর্বাদ করলেন।

যদিও বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী স্বামী নিমাইয়ের এই পরিবর্তন লক্ষ্য করলেও, স্বামীকে গৃহে ফিরে আসার জন্য অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। হায় অদৃষ্ট! বিষ্ণুপ্রিয়ার জীবনের সুখ বেশীদিন স্থায়িত্ব পেল না। এই পরিবর্তিত নিমাইয়ের মন সকল জীবকুলকে

উদ্ধারের জন্য ছটফট করছে, সর্বদা উদাসীনের মত 'হা কৃষ্ণ, হা কৃষ্ণ' বলে ক্রন্দন করছে। নিমাই পণ্ডিতের শিক্ষা দেওয়ার টোল বন্ধ হয়ে গেল। শচীমাতা নিমাইয়ের এরূপ ব্যবহারে উৎকণ্ঠিত হয়ে বিষ্ণুমন্দিরে গিয়ে অশ্রু বিসর্জন করতে লাগলেন। মাতা হিসাবে, তিনি বিষ্ণুমন্দিরে গিয়ে নিমাইয়ের শুভ কামনা চাইলেন। শেষ পর্যন্ত তিনি গোবিন্দ অর্থাৎ ভগবানের শরণ নিলেন।

''আরম্ভিলা মহাপ্রভু আপন প্রকাশ।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডময় হইল উল্লাস॥''

নিমাই প্রেমবন্যার দ্বারা বাংলাদেশকে প্লাবিত করে বাহিরে ছড়িয়ে দিতে ব্যাকুল হয়ে পড়লেন। এরপর প্রভু স্থির করলেন—তিনি সংসারের সমস্ত মায়া পরিত্যাগ করে ''সন্ন্যাস'' গ্রহণ করবেন। শচীমাতা এই সংবাদে অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে বজ্রাহতের মতো মাটিতে লুটাইয়া পড়িলেন। শচীমাতার এই ব্যাকুলতা, ক্রন্দন কোন কিছুই নিমাই পণ্ডিতকে তাঁর সিদ্ধান্ত থেকে সরাতে পারলো না। যিনি বিশ্বের মানুষকে প্রেম দ্বারা জয় করতে চান, তাঁর এই বিশ্বপ্রেমকে কে রোধ করবে? তিনি তো পতিতপাবণী। এদিকে মাতৃ-অনুমতি ছাড়া তিনি সন্ন্যাস নিতে পারছেন না। যিনি অবতার রূপে এসেছেন, কোন বাধাই তাঁর সঙ্কল্প থেকে বিচলিত করতে পারে না। শেষ পর্যন্ত মাতার অনুমতি নিয়েই সন্ন্যাস-ধর্ম নিলেন। শচীমাতা ধর্মশীলা বলেই তাঁর পুত্র নিমাই এরূপ ধর্মপরায়ণ হতে পেরেছিলেন। সন্ন্যাস পরবর্তী তাঁর নাম হলো 'শ্রীচৈতন্য'।

ধর্মপ্রাণা পত্নী বিষ্ণুপ্রিয়া লোকমুখে স্বামীর সন্ন্যাস সঙ্কল্পের কথা জানতে পেরে অত্যন্ত দুঃখে ভেঙে পড়লেন। স্বামী-গৃহে প্রত্যাবর্তন করলে বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী ধীর পদক্ষেপে স্বামীর চরণতলে লুটাইয়া পড়িলেন। তিনি বলিলেন—''তুমি প্রেমের সাগর, সকলকেই তিনি প্রেম বিলোচ্ছেন, তিনি তাঁর ধর্মপত্নীকে এতটুকু কৃপা করলেন না, কিভাবে তিনি থাকবেন, পতি বিনা তাঁর বেঁচে থাকার প্রয়োজন কি? নিমাই বিষ্ণুপ্রিয়াকে নানাভাবে বোঝাতে লাগলেন 'কৃষ্ণই জগতের সকলের পতি, তিনি (কৃষ্ণ) ছাড়া কেহ কাহারো নয়।' প্রত্যুত্তরে বিষ্ণুপ্রিয়া স্বামীর চরণতলে বসে বললেন, সে একজন অতি সামান্যা নারী, স্বামীকে পেয়ে অতি সৌভাগ্যশালিনী হয়েছিলেন। কিন্তু এখন তাঁর কি হবে?

সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্বরাত্রে নিমাই পণ্ডিত এক অপূর্ব লীলা প্রকট করলেন। শয়ন মন্দিরে দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া স্বামী সকাশে আসছেন—একটু যেন সঙ্কুচিতা। নিমাই মৃদুস্বরে বিষ্ণুপ্রিয়াকে ডেকে পালঙ্কে বসালেন। দেবী প্রভুর শ্রীঅঙ্গে চন্দন চর্চিত করে সাজালেন। নিমাইও স্ত্রীকে সুন্দর করে সাজিয়ে দিলেন। মনে হল বিচ্ছেদের পূর্বে চির-মিলনের এই ইঙ্গিত—

''বৈরাগ্য সময়ে প্রেমা উহারে অধিক''।

এই লীলা রহস্যের জাল ছিন্ন হতে বেশী দেরী হল না। প্রভাত হওয়ার পূর্বে নবদ্বীপচন্দ্র (নিমাই) নবদ্বীপ ছেড়ে চলে গেলেন।

শচীদেবী পুত্রের অন্তর্ধানে কাঁদিয়া আকুল হলেন। বারবার তিনি 'নিমাই, নিমাই' বলে ডাকতে লাগলেন, প্রতিধ্বনি বলে 'নাই, নাই'। নবদ্বীপবাসী ভক্তগণ শচীমাতা ও বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকে প্রবোধ দিতে লাগলেন। তাদের ভাষা অনুযায়ী, এই ভুবন-পাবন খেলা তো নিমাই ও বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী উভয়ের মিলিত খেলা—

'বহুত পরশ রস অদরশ কেলী-
গোবিন্দ দাস হেরি বিমোহিত ডেলী॥'

অখিল জগতে যিনি প্রেম বিলোতে এসেছেন, প্রেমময়ী স্ত্রী বিষ্ণুপ্রিয়াকে তিনি কি বিস্মৃত হতে পারেন।

শ্রীনিবাস আচার্য্য 'গোরা' প্রেমে অভিভূত হয়ে নবদ্বীপের উদ্দেশে ছুটছেন। 'ভক্তি রত্নাকর' বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর এই সুন্দর স্বপ্ন সুললিত ভাষায় প্রকাশ করলেন—

'একা বিষ্ণুপ্রিয়া, প্রিয়দাসী প্রতি কয়
দেখিনু স্বপন, কহি মনে যে আছয়
ভুবন-মোহন প্রভু, মোর প্রাণপতি
আইলা আমার আগে, কি মধুর গতি॥'

মায়াজালে আবদ্ধ জীবজগতকে উদ্ধার করে অমৃতের সন্ধান দেবেন, এই উদ্দেশেই শ্রীচৈতন্য ছুটছেন। আজানুলম্বিত দুই বাহু তুলে 'হরি হরি' 'হা কৃষ্ণ কোথা কৃষ্ণ' ধ্বনিতে সকলকে আকৃষ্ট করছেন। জগত্তারিণী বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী, শ্রীচৈতন্যের শক্তি হিসাবে অলক্ষে কাজ করছেন।

শ্রীনিবাস নবদ্বীপে দেবী বিষ্ণুপ্রিয়ার দর্শন পেলেন—বিষ্ণুপ্রিয়া সম্বন্ধে তিনি বললেন—

'প্রভু-বিচ্ছেদে দাবানলে জ্বলে হিয়া
তথাপি উল্লাস, শ্রীনিবাসে নিরমিয়া
বাৎসল্য অনুগ্রহে কহি মধুর বচন
শ্রীনিবাস মস্তকে দিলেন শ্রীচরণ॥'

চিরদুঃখিনী বিষ্ণুপ্রিয়া। চৈতন্য-পার্ষদ নিত্যানন্দ প্রভু, মহাপ্রভুকে (চৈতন্যদেবকে) ভুলাইয়া শান্তিপুরে নিয়ে এলেন অদ্বৈত আচার্য্যের গৃহে। সকল নবদ্বীপবাসী ভক্ত নদীয়ার

শান্তিপুরে তাঁদের প্রিয় মহাপ্রভু, শ্রীচৈতন্যকে দর্শন করতে এলেন। মহাপ্রভু, মাতৃদেবীর চরণ দর্শন অভিলাষ ব্যক্ত করায়, শচীদেবীকেও সেখানে আনয়ন করা হল। পতিপ্রাণা বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর শান্তিপুরে স্বামী-দর্শনের অনুমতি মিললো না।

ভুবনদাস, বৈষ্ণব-পদকর্তা-বিষ্ণুপ্রিয়ার এই অন্তর বেদনা অপূর্বভাবে প্রকাশ করলেন—

''যদি হন বেরী শান্তিপুর আওল
নাহি আওল নিজধাম
তাহা সঙ্কীর্তন প্রেম বিতরণ
পুরল তনু-মন কাম''
. . .
''প্রভুর দর্শনে যাঁর সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন
প্রভু যাঁর জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ ধন
জীবের কল্যাণে যিনি
আপনার হৃৎপিণ্ড করি উৎপাটন
পরিপূর্ণ করেছেন প্রেমের সাধন
যাঁর মহা অনুগ্রহে শ্রীগৌরাঙ্গ আজ মহাপ্রভু
শুধু সেই ভাগ্যহীনা বিষ্ণুপ্রিয়া
পাবে না দরশন কভু
নিতাই-এর কথা শুনি, চক্ষু মোর ভরে এল জলে।
উদ্দেশ্যে প্রণাম দিনু, শতবার প্রভুর চরণ শতদলে॥'

শচীমাতা শান্তিপুরে চলে গেলে, বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী একাকী গৃহকোণে বসে কাঁদতে কাঁদতে নিজেকে আর সংযত করতে পারলেন না।

এই মর্মস্পর্শী দৃশ্য অপূর্ব পয়ারে বর্ণনা করা হয়েছে—

''কাঁদে দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া নিজ অঙ্গ আছাড়িয়া
লোটাইয়া লোটাইয়া ক্ষিতি তলে
কহে নাথ কি করিলে পাতারে ভাসায়ে গেলে
কাঁদিতে কাঁদিতে ইহা বলে
এ ঘর জননী ছাড়ি মোরে অনাথিনী করি
কার বোলে করিলা সন্ন্যাস
বেদে শুনি রঘুনাথ লইয়া জানকী সাথ
তবে সে করিলা বনবাস॥''

এত দুঃখ-কষ্ট, অন্তর্বেদনা সত্ত্বেও পতিপ্রাণা বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী পতির ইচ্ছাতেই সম্পূর্ণ আত্ম-নিবেদন করলেন, মহাভাবের বিলাস, মহতী বেদনায় প্রভাব বিস্তার করে।

এই অবস্থাকে স্মরণ করে পদকর্ত্তা বলরামদাস লিখলেন—

''আপনি যে সব তুমি (চৈতন্যদেব) নিয়ম পালিবে
তা হতে কঠোর নিয়ম এ দাসীরে দিবে
বাঁচিব ত্যজিয়া আমি ভূষণ ভোজন
সুখেতে করিব আমি মাটিতে শয়ন
লোকে বলে তুমি নাকি আমার লাগিয়া
গার্হস্থ্য ছাড়িয়া গেলে সন্ন্যাসী হইয়া
কেন আমি তোমার কি করিলাম ক্ষতি
কোনদিন সংকীর্ত্তনে কি করেছি আপত্তি।।''

বিরহিণী বিষ্ণুপ্রিয়া পুত্রশোকে কাতর শচীমাকে নিয়ে নবদ্বীপে যেন দ্বিতীয় গম্ভীরার সৃষ্টি করলেন। (প্রথম গম্ভীরা পুরীতে চৈতন্য মহাপ্রভু যে ঘরে থাকতেন) বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর দুঃখের কথা মনে করলে পাষাণও বিগলিত হয়।

''জগত তারিতে এসে মোরে ছাড়িলে
অভাগী পাপীনী বলে দুঃখ ডারিলে
মো সম পাপীনি নাই—তাই হে দিলে না ঠাঁই।''

এরপর শচীমাতাও একদিন অপ্রকট হলেন (দেহত্যাগ) বিরহিণী বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী কঠোর ভজনে নিজেকে নিবিষ্ট করলেন। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি এই ভজন করে গেছেন।

''ঈশ্বরীর (বিষ্ণুপ্রিয়া) নাম গ্রহণ শুন ভাই সব
যে কথা শ্রবণে লীলার হয় অনুভব
নবীন মৃৎভাজন আনি দুই পাশে ধরি
এক শূন্য পাত্র, আর পাত্রে তণ্ডুল ভরি
একবার জপে যোল নাম বত্রিশ অক্ষর
এক তণ্ডুল রাখেন পাত্রে আনন্দ অন্তর
তৃতীয় প্রহর পর্যন্ত লয়েন হরিনাম
তাতে যে তণ্ডুল হয় লৈয়া পাকে যান
সেই যে তণ্ডুল মাত্র রন্ধন করিয়া
ভক্ষণ করান প্রভুকে অশ্রুসিক্ত হয়িা
রাত্রিদিন হরিনাম প্রভুর সংখ্যা যত
সে চেষ্টা বুঝিতে নারি বুদ্ধি অভিহত।''

তপঃপ্রভাবে জ্বলমান জননী বিষ্ণুপ্রিয়া। আজীবন পতিবিরহে কাতর হয়েও এক মুহূর্তের জন্য পতির চিন্তা থেকে সরে যান নি—

শ্রীচণ্ডীর ভাষাতেই দেবী বিষ্ণুপ্রিয়াকে বন্দনা করা যায়—

''বিদ্যাঃ সমস্তা স্তব দেবী ভেদাঃ
স্ত্রিয় সমস্তাঃ সকলা জগৎসু
ত্বয়ৈকয়া পুরিতমনুয়ৈতৎ
কা তে স্তুতিঃ স্তবাপরাপরোক্তি।''

মহামিলন মঠে শ্রীশ্রীঠাকুরের লীলা প্রসঙ্গ

হি মা ং শু রা য়

(২)

ঐদিন সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত পণ্ডিত সভায় বঙ্গদেশের খ্যাতনামা পণ্ডিতগণ ঠাকুরের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন এবং বর্ণাশ্রম রক্ষার জন্য প্রার্থনা জানান। শ্রীমধুসূদন ন্যায়াচার্য্য বলেন—এই মহাপুরুষের সকল দেবতায় সমান মর্যাদা, যা অতি বিরল। তিনি সকল সম্প্রদায়কে আপনভাবে পদাশ্রয় দিয়েছেন। তিনি বৈদিক ধর্ম, বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা রক্ষা করে চলেছেন। পূর্ণভাবে প্রতিফলিত করেছেন। বিভূতিভূষণ ন্যায়তর্কতীর্থ বলেন—এঁর জন্মতিথি মানব জীবনের অবিস্মরণীয় ঘটনা। তিনি নিজের জীবনে দিয়ে বর্ণাশ্রম ধর্মের সত্যতায় প্রতিষ্ঠিত করে চলেছেন। তিনি আমাদের মধ্যে বর্ণাশ্রম ধর্মের সত্যতার প্রতিষ্ঠার জন্য আবির্ভূত। মহামহোপাধ্যায় শ্রীকালীপদ তর্কাচার্য্য বলেন—প্রাচীন সনাতন ধর্ম আজ বিপর্যস্ত। শাস্ত্রোপদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে আমরা ক্রমশঃ অধঃপতিত, রোগগ্রস্ত, অকাল মৃত্যুপথ যাত্রী। এখন প্রয়োজন যে মহাপুরুষের সেই মহাপুরুষ আমাদের সম্মুখে—ধর্মকে উন্নীত করার জন্য জগতে অবতীর্ণ। শাস্ত্রের সত্য প্রমাণ করার জন্য, ধর্ম প্রতিষ্ঠা করার জন্য আবির্ভূত। তাঁর জন্মতিথি ফাল্গুনী কৃষ্ণাপঞ্চমী ''ওঙ্কারপঞ্চমী'' নামে অভিহিত হোক নানা পঞ্জিকায়। সূর্য্য নারায়ণ ঝাঁ বলেন—এইরূপ মহাপুরুষের আবির্ভাব উৎসব পালনের উদ্দেশ্য—মহাপুরুষের পথ অবলম্বন, তাঁর উপদেশ বাণী অনুসরণ ও দীর্ঘায়ু কামনা করা। স্বয়ং জগজ্জননীর আবির্ভাব সীতারামরূপে সনাতন ধর্মের উপর আঘাত নিবারণ করতে। এই প্রচার দ্বারা, উপদেশ দ্বারা, উপদেশাবাণী নিজে অনুসরণ করে জনগণকে শান্তির রাস্তা দেখাচ্ছেন। লক্ষণ মিলিয়ে নিলে সভায় তাঁকে মহাপুরুষই বললাম। গোপালনাথ ভট্টাচার্য্য—বৈদিক সনাতন ধর্মই শ্রেষ্ঠ। তা যখন আঘাত প্রাপ্ত হয়, তখনই মহাপুরুষগণ আবির্ভূত হন। ৭৮ বৎসর পূর্বে 'সম্ভবামি যুগে যুগে' তাঁর স্মরণ হয়েছিল। গোপাল পঞ্চতীর্থ বলেন—তিনি নিজে সব আচার পালন করে শিক্ষা দিচ্ছেন। সহজ উপায় দেখিয়েছেন নামকীর্তন কর, জ্ঞান, ভক্তি, কর্মের ত্রিবেণী নামে এই মহাপুরুষ। ধর্ম রক্ষার জন্যই তাঁর অবতরণ। পরিশেষে ঠাকুর বলেন—'বাঁশী বাজে, বাজান তিনি। আপনারা শাস্ত্র রক্ষা করুন, বর্ণাশ্রম ধর্ম রক্ষা করুন।'

৩রা ফাল্গুন কিশোর ও যুবক সংঘ দিবস

তিন বৎসর পূর্বে শ্রীঠাকুর ব্যারাকপুরে জাহ্নবী কুঞ্জে অসুস্থ থাকাকালীন এই সংঘের অবতরণ হয় এবং তাঁর উপস্থিতিতে কয়েকটি পাক্ষিক অধিবেশন শুরু হয়। তখন তাহা কিঞ্চিৎ প্রসারিত হয়ে বর্ধমান, ডুমুরদহ ও রাণীগঞ্জে শাখা বিস্তার করেছে। কিশোর ও যুবকদের মধ্যে এই সংঘ নীতি, সংযম, সদাচার, তথা সনাতন হিন্দু ধর্মের আদর্শে জীবন গঠনের শিক্ষা বিস্তারে ব্যাপৃত। তাদের পাক্ষিক অধিবেশনে যা করা হয় ঠাকুরের সামনে তাই অনুষ্ঠিত হলো। তা কলিকাতা সংঘের আচার্য্য ডাক্তার উমেশচন্দ্র চক্রবর্তীর পরিচালনায়। ৪০জন সত্য এই অধিবেশনে যোগ দান করে। চিত্তাকর্ষক বিষয় ছিল একটি বিতর্ক সভা। ধর্ম ও নীতি বর্জিত কুশিক্ষায় বিষরপে বিদ্যার্থীর জীবন আজ যেভাবে বিপর্য্যস্ত তা থেকে এই বুদ্ধিমান ছেলেদের রক্ষা করার উপায় চিন্তা করেই ঠাকুর সৃজন করেন এই সংঘ। ঐদিন তাই ওরা একটি বিতর্কের মাধ্যমে সেই আলোচনারই চমৎকার একটি দৃষ্টান্ত দেখায়। বিচার্য্য বিষয় ছিল—বর্তমান যুগে বর্ণাশ্রম ধর্ম পালন করা বা করবার চেষ্টা করা—অসম্ভব, নিরর্থক, ক্ষতিকর। পক্ষে ও বিপক্ষে ৩জন করে বক্তা ছিল। এদের বিতর্ক বিপুলায়তন শ্রোতৃ মণ্ডলীকে মুগ্ধ করে। শ্রীশ্রীঠাকুর আনন্দে উচ্ছসিত হন।

২ ঘণ্টার বেশী সময় ধরে চলে সেই বিতর্ক। সর্বশেষে শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর উদাত্ত কণ্ঠে প্রায় সওয়া ঘণ্টা ধরে এক অপূর্ব ভাষণ দেন। বহু দিন এই কণ্ঠ শোনা যায়নি। জড়বাদ খণ্ডন থেকে শুরু করে জীবন গঠন ও ভারতীয় জীবনের মূল লক্ষ্য যে পূর্ণতাপ্রাপ্তি, সে কথা বিষদভাবে ব্যাখ্যা করেন। আজ যে ধ্বংস স্রোত নেমে আসছে, পাশ্চাত্যের ভোগ মদিরা আমাদের মধ্যে যেভাবে বিভ্রান্তি ঘটাচ্ছে, বেশভূষায় পর্যন্ত আমরা যে স্বজাত্য অভিমান থেকে বিচ্যুত—সে কথা তীব্র ভ্যর্থনার সহিত ঘোষণা করেন। আবার অন্তরের আনন্দ রাজ্যে আসবার জন্য যখন পথহারাদের ডাক দিচ্ছিলেন তখন তাঁর কণ্ঠে স্নেহ, প্রেম ও করুণাধারা যেন অমৃত ঝরণার মত শোনাচ্ছিল। প্রসঙ্গক্রমে ভূপেশদা বলতেন—ঠাকুরের কণ্ঠ একেবারে কঙ্কু কণ্ঠ ছিল)।

৩রা ফাল্গুন অপরাহ্নে শ্রীশ্রীসীতারাম সংস্কৃত প্রজ্ঞা মহাবিহার দিবস উদ্‌যাপিত হয়। পরিচালনা করেন অধ্যাপক ধ্যানেশ নারায়ণ চক্রবর্তী। সকলেই সহজ সংস্কৃত ভাষায় শ্রীশ্রীঠাকুরকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

১৮ই ফাল্গুন, রবিবার শ্রীশ্রীঠাকুর বেলা প্রায় সাড়ে ১১টায় মদ্রহামিলন মঠে শুভাগমন করেন। উপস্থিত হওয়া বহু নরনারীকে স্পর্শ প্রণাম দানে কৃতার্থ করেন। 'পথের আলো'র সম্পাদক গোপীনাথ ভট্টাচার্য্য উপস্থিত ছিলেন। বহু লোকের প্রার্থনা ঠাকুর পূরণ করছিলেন। একটি মায়ী একটি মেয়েকে উপস্থিত করিয়া জানাইলেন যে মেয়েটির বিবাহ হইতেছে না, শ্রীশ্রীঠাকুর তাহাকে শিব পূজা করিতে বলিলেন। একটি শোকার্ত মায়ী আকুল কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন—''বাবা, আমার স্বামী ফিরে আসবে তো?" ঠাকুরটি তাহাকে নাম করিতে ও জপ করিতে নির্দেশ দিলেন। একটি মেয়ে ৬০ টাকা ফাইনাল পরীক্ষার জন্য ঠাকুরের নিকট চাহিলে ঠাকুর সর্বাধীশ তারকদার নিকট হইতে টাকা নিতে বলিলেন। আর একটি ৭৫ বৎসরের বৃদ্ধ ঁনিগমানন্দ সরস্বতী মহারাজের শিষ্য ঠাকুরের চরণে পরমার্থ লাভের প্রার্থনা জানাইলেন। ঠাকুর তাহাকে ২।৩টি প্রশ্ন করিলেন। তিনি নীলাচল আশ্রমে থাকিবার অভিপ্রায় জানাইলে শ্রীঠাকুর তাহার সেই প্রার্থনা মঞ্জুর করিলেন। আর এক বৃদ্ধ প্রচারক (ভাগবত ও শিব কথা বলেন) শ্রীঠাকুরের নিকট তাহার রচিত এক সেট বই প্রার্থনা করিলে শ্রীঠাকুর তারকদাকে জানাইতে নির্দেশ দেন। ইহার মধ্যেও শ্রীঠাকুর দীক্ষার্থীদের মন্ত্রদান ও প্রণাম গ্রহণ করিতেছিলেন। শ্রীঠাকুর রমেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরীকে বলেন হাসি মুখে, 'দেখছিস্ লোকজন নাকি ধর্ম পরায়ণ নয়)।

২৮শে ফাল্গুন একবার মঠে আসেন ও চলে যান।

ক্রমশঃ

ওঙ্কারনাথ মিশনের পরিচালনায়
বিশিষ্ট এবং স্বনামধন্য ব্যক্তিগণের উপস্থিতিতে কাশীরামাশ্রমে
গত ৩০-৯-২০১৪ বস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠান

কাশীরামাশ্রমে গত ৩০-৯-২০১৪ আশ্রমের সভামঞ্চে উপস্থিত
বিশিষ্ট স্বনামধন্য ব্যক্তিবর্গ

(সবিনয় নিবেদন,

'পথের আলো'র সহৃদয় গ্রাহক, মণ্ডলীর প্রতি সবিনয় নিবেদন এই যে, গত ৭ বৎসর যাবত শ্রীশ্রীঠাকুরের বিভিন্ন মঠ, আশ্রমের নানা ভূমিসম্পত্তি কিছু ব্যক্তিবর্গের অসাধু প্রচেষ্টার আওতায় ও কুনজরে এসেছে, এবং ঐ ব্যক্তিরা নানাভাবে নানা সময়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের স্থাবর সম্পত্তির অধিকার না থাকা সত্ত্বেও নানা অসাধু পথে বিক্রয় করার প্রচেষ্টা করে যাচ্ছেন এবং বিক্রয়ও করছেন। নানা তছরূপের সঙ্গে যুক্ত ঐ ব্যক্তিরা শ্রীশ্রীঠাকুরের নিযুক্ত অখিল ভারত জয়গুরু সম্প্রদায়ের ট্রাস্টি বোর্ড সম্পর্কে নানা মিথ্যা কথা বলে সর্ব সাধারণকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে যাচ্ছেন। একইসঙ্গে তারা সম্প্রদায়ের সর্বজনপূজ্য আচার্য্যদেব ও পূজ্যচরণ সর্বাধীশ শ্রীমৎ কিঙ্কর বিঠ্ঠল রামানুজ মহারাজজী এবং সকলের শ্রদ্ধেয় সংঘ সঞ্চালক অধ্যাপক গোপাল মিত্র মহাশয় সম্পর্কে মিথ্যা কুৎসা রটনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। এই ধরনের ঘৃণ্য আচরণকারী ব্যক্তিদের কর্মকাণ্ড ও দুরভিসন্ধি সর্বজন সমক্ষে প্রকাশ করা জরুরী মনে করে আমরা নিম্নোক্ত তথ্য পরিবেশন করছি। গত সাত বৎসর আমরা ঐ ব্যক্তিদের সম্মান যাতে নষ্ট না হয় তাই আগে যা ঘটেছে সেগুলি প্রকাশ বিষয়ে ধৈর্য্য ধারণ করেছি। কিন্তু বর্তমানে শ্রীশ্রীঠাকুরের সম্প্রদায় শরীর যাতে বিঘ্নিত না হয় তাই নিম্নোক্ত বিবৃতি প্রকাশ করতে বাধ্য হলাম। এই বিষয়ে আপনাদের সহৃদয় সহযোগিতা ও সকলের সচেতনতা আমরা কামনা করি।)

ঃ শ্রী ভগবান সীতারামের সম্পত্তি লুট ঃ

কেওটা-কালনা থেকে কন্যাকুমারী, উড়িষ্যা থেকে উত্তরাঞ্চল, ঝাড়খণ্ড থেকে উত্তরাখণ্ড, বিহার থেকে বৃন্দাবন বিস্তৃত শ্রীশ্রীঠাকুরের মালিকানাধীন প্রায় দেড়শতাধিক ভূসম্পত্তি, মঠ-মন্দির নিজের নামে না রেখে, ভবিষ্যৎদ্রষ্টা ভগবান সীতারাম তাঁর মানসপুত্র হিসাবে 'অখিল ভারত জয়গুরু সম্প্রদায়' (ABJS) সৃষ্টি করে ১৯৭৩-এর ২২শে জানুয়ারী, (RA, Calcutta) তে, ৩৮৫ নং ট্রাস্ট-ডিড (Trust-Deed) পঞ্জীকরণের মাধ্যমে উক্ত সকল সম্পত্তির মালিকানা ABJS এর এক্তিয়ারভুক্ত বা মালিকানাধীন করান। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য অন্তর্যামী ওঙ্কারনাথ ভবিষ্যতের পরিণতির কথা ভেবেই উক্ত Trust-Deed-এ বা অন্য কোনও দলিল-দস্তাবেজে ভুলবশতঃ ও অন্য কারও উত্তরাধিকার বা Succession Right এর উল্লেখ অথবা স্বীকার না করেই ১৯৮২-তে ওঙ্কারলোক প্রাপ্ত হন।

পরমারাধ্য শ্রীশ্রীঠাকুরের উপরোক্ত ব্যবস্থা ডুমুরদহের পূজ্যপাদ ঁরঘুনাথ চট্টোপাধ্যায়ের পুত্রগণ (শ্রী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রী দীনবন্ধু চট্টোপাধ্যায়, শ্রী জগৎবন্ধু চট্টোপাধ্যায়) সহ তাঁদের পরিবারের অন্য নয়জন সদস্য অস্বীকার করেন এবং বছর ৬-৭ ধরে প্রকৃত সত্য গোপন রেখে অসদুপায়ে জাল নথিপত্র বানিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর প্রতিষ্ঠিত ABJS এর সম্পত্তির অধিকার ছিনিয়ে নিতে সচেষ্ট হয়েছেন। যদিও বেনারসের কাশী রামাশ্রমে, পাণ্ডে হাবেলীর কালীমন্দিরে, পুরীর নীলাচল আশ্রমে এই চেষ্টা চালিয়েও তাঁরা আজও সফল হতে পারেননি।

৬ই ফেব্রুয়ারী ২০১৩ তারিখে খবর আসে শ্রী জগৎবন্ধু চট্টোপাধ্যায় (প্রভু) শ্রীশ্রীঠাকুর প্রতিষ্ঠিত মধুপুরের (ঝাড়খণ্ড) 'গুরুধাম আশ্রম' বিক্রি করে দিচ্ছেন। এই খবর পাওয়া মাত্র কর্তৃপক্ষ যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ায় সে যাত্রা 'গুরুধাম আশ্রম' রক্ষা পায় এবং প্রভু সাময়িক পলায়ন করেন।

১১ই আগষ্ট ২০১৪, বিশ্বস্তসূত্রে আবার খবর আসে 'গুরুধাম আশ্রম' বিক্রি হয়ে গেছে। তৎক্ষণাৎ প্রত্যায়িত নকল বার করে দেখা যায় ঃ

(১) প্রভু গুরুধামের মোট ৩২ কাঠা জমির মধ্যে (৮+৮) ১৬ কাঠা জমি শ্রীমতী মীনা মোদি ও শ্রী দীনেশ মোদিকে গত ১০-০৬-২০১৪ তারিখে মধুপুর সাব-রেজিস্ট্রী অফিসের ১৫৬ ও ১৫৭ নং দলিলের মাধ্যমে ৩,৬০,০০০ (প্রতি ৮ কাঠা) হিসাবে মোট ৭,২০,০০০ টাকায় বিক্রি করে দিয়েছে।

(২) অবিশ্বাস্য হলেও প্রমাণিত হয় যে, গত ১০ই এপ্রিল ২০১৪ তারিখে শ্রী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রী দীনবন্ধু চট্টোপাধ্যায় সহ তাঁদের পরিবারের অন্য নয়জন সদস্য শ্রীশ্রীঠাকুরের উত্তরাধিকারী হিসাবে শ্রী জগৎবন্ধু চট্টোপাধ্যায়কে (প্রভু) ডুমুরদহের ডিস্ট্রিক্ট সাব-রেজিস্টী অফিসের ৮৮নং রেজিস্টার্ড ডিড অব পাওয়ার অব অ্যাটর্নির মাধ্যমে কনস্টিটিউটেড্ অ্যাটর্নি নিযুক্ত করে, ঝাড়খণ্ড সহ পশ্চিমবঙ্গে ঠাকুরের নামাঙ্কিত সমস্ত সম্পত্তি বিক্রি করে দেবার অধিকার বা পাওয়ার প্রদান করেন। বলাবাহুল্য মধুপুরে সার্থকতা পেলে মহামিলন মঠ সহ পশ্চিমবঙ্গে ABJS এর মালিকানাধীন ঁঠাকুরের অন্যান্য মঠ, মন্দির, আশ্রম, জমি জায়গাগুলো অসদুপায়ে বিক্রি করে দিয়ে অর্থপার্জন করাই এদের একমাত্র লক্ষ্য। উক্ত দীনবন্ধু ও প্রভু এরূপ অবৈধ, অন্যায়, জালিয়াতি করবে এতে অবাক হবার কিছু নেই, তবে সর্বগুণসম্পন্না সহধর্মিণীর স্বামী, সার্থক পুত্র-কন্যার পিতা এবং আলটিমেটলি গুরুগিরি অবলম্বনকারী, সপার্ষদ-নামকারী, মিষ্টভাষী, শ্রী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় যাঁকে দেখামাত্র তাঁর শিষ্য ভক্তরা সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করেন—তিনি কি করে এই দুষ্টচক্রের জালিয়াতির

অংশীদার হলেন, এটা ভেবে আমরা শুধু অবাক হই না—লজ্জাও পাই তবুও শ্রীশ্রীঠাকুরকে বলি 'বাবা, এদের সুবুদ্ধি দাও'।

(৩) এই জালিয়াতির আরেকটি প্রমাণ স্বরূপ দেখা গেল যে উক্ত ১৫৬ ও ১৫৭ নং দলিল দুটিতে Annexure হিসাবে ০৫-০৬-১৯৫৮ তারিখে R.A. Calcutta তে রেজিস্ট্রীকৃত ১১০৬ নং যে দলিলের মাধ্যমে স্বর্গীয় বিরল চন্দ্র ব্যানার্জী শ্রীশ্রীঠাকুরকে মধুপুরের উক্ত দ্বিতল অট্টালিকা সহ যে ৩২ কাঠা জমি দান-পত্র (Deed of Gift) করে দেন—তার প্রত্যায়িত নকল সংযুক্তিকরণ করা হয়েছে, অথচ ১৯৭৩ এর ২২শে জানুয়ারী RA, Calcutta তে ৩৮৫ নং ট্রাস্ট-ডিড (Trust-Deed) পঞ্জিকরণের মাধ্যমে, শ্রীশ্রীঠাকুর যে তাঁর সকল সম্পত্তির মালিকানা ABJS এর এক্তিয়ারভুক্ত বা মালিকানাধীন করান—তার নাম গন্ধেরও উল্লেখ করা হয়নি। **দুষ্টের ছলের অভাব হয় না—কিন্তু বিনাশকালে বিপরীত বুদ্ধি অবশ্যই হয়।**

(৪) করোঁ মধুপুর, জেলা দেওঘর, অঞ্চল অধিকারীর (CO) কর্মচারীদের সঙ্গে যোগসাজসে বা তাদেরকে ভুল বুঝিয়ে কোন প্রকার মিউটেশন কেস নম্বর (MC No.) ছাড়াই, দুঃসাহসিক পদক্ষেপ নিয়ে উক্ত সম্পত্তিটির মাত্র ১০ বছরের মিউটেশন খাতে সীতারামের নামে খাজনা জমা করিয়ে প্রাপ্ত ২০৬৬ নং রসিদটির নকল, মধুপুর সাব-রেজিস্ট্রী অফিসে দেখিয়ে উক্ত Sale-Deed দুটি রেজিস্ট্রী করিয়ে নিয়ে কুকর্ম হাসি করে নেয়।

(৫) ২০০৪ সন থেকে 'গুরুধাম আশ্রম' এর পূজারী হিসবে শ্রী শশীভূষণ (ওরফে শশীকান্ত) পাঠককে বাকি ১৬ কাঠা জমি দান-পত্র করে দেবার অঙ্গীকার এবং তার মেয়ে দুটির বিয়েতে অর্থ সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিশ্বাসঘাতক, লোভী, তস্কর শশীকে হাত করে নেওয়ায়, শশী ABJS কে অদ্যাবধি কিছু না জানিয়ে উক্ত দলিল-দুটিতে সাক্ষী হিসাবে আঙ্গুলের ছাপ, ছবিসহ হস্তাক্ষর প্রদান করে সম্পত্তি প্রাপ্তির আশায় মশগুল হয়ে আছে।

দুর্বৃত্তের দল শ্রীশ্রীঠাকুরের সম্পত্তি চুরি করে বেচে দিল—অথচ ABJS কিছু জানল না, এই সত্যের মুখোমুখি হয়ে সম্প্রদায়ের সর্বাধীশ কিঙ্কর বিঠ্ঠল রামানুজ, সহ-সর্বাধীশ ডঃ লোকনাথ চক্রবর্তী, সাধারণ সম্পাদক প্রফেসর (ডঃ) গোপাল মিত্র, যুগ্ম সম্পাদক শ্রী সুব্রত রায়চৌধুরী সহ সম্প্রদায়ের অন্যান্য সীতারামানুরাগীগণ নিজেদেরকে অপরাধী ভেবে, বেদনাক্লিষ্ট মনে শ্রীশ্রীঠাকুরের সম্পত্তি পুনরুদ্ধারে এবং চক্রান্তকারী অপরাধীদের যথোপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করতে আপোষহীন মরণপন আইনি লড়াই চালিয়ে যেতে অঙ্গীকারবদ্ধ হন এবং কিঙ্কর বিরাগানন্দ, শ্রী কে সেনশর্মা ও শ্রী চন্দ্রনাথ ব্যানার্জীকে এই মর্মে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের দায়িত্ব দেন—তাঁরা ইতিমধ্যেই আইনের শাসনে বিশ্বাস রেখে, রাঁচি হাইকোর্টে, ঝাড়খণ্ড সরকারের বিরুদ্ধে একটি রিট পিটিশন দাখিল করে মধুপুর এস.ডি.জে.এম.-এর আদালতে শ্রী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় সহ ঐ পরিবারের বাকি ১১জন, ২জন ক্রেতা এবং পূজারী শশী সমেত মোট ১৫ জনের বিরুদ্ধে একটি ফৌজদারী এবং দেওঘর ডিস্ট্রিক্ট কোর্টে উক্ত ১৫ জনের বিরুদ্ধে একটি দেওয়ানি মামলা রুজু করে আদালতের রায় মাথা পেতে নেওয়ার অপেক্ষায় আছেন।

বর্তমান Board of Trustees শ্রীশ্রীঠাকুরের সম্পত্তি ধরে রাখতে এবং তার শ্রীবৃদ্ধি করতে অযোধ্যা, কন্যাকুমারী, ভেট দ্বারকা (শ্রী মুকেশ চতুর্বেদীর নেতৃত্বে), পুরী, চন্দননগর, তারিঘাট, মহামিলন মঠ, কাঁথি, গঙ্গাসাগর সহ অন্যান্য মঠ-মন্দিরে, লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে চলেছেন এবং এইরূপ আরও খরচের জন্য ব্যয় বরাদ্দ করেছেন।

এ ছাড়াও সম্প্রতি রামপুরহাটে 'গিরিধারী-গোপাল' এর একটি সুদৃশ্য মঠ-মন্দির এবং তারাপীঠে 'তারা-মা' এর আরেকটি মঠ-মন্দির অধিগ্রহণের প্রক্রিয়া ABJS ইতিমধ্যেই চালু করেছে।

আনন্দের সঙ্গে জানাই যে, নবদ্বীপে শ্রীশ্রীঠাকুরের ৫৫ ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট একটি সুদৃশ্য মন্দির নির্মাণের জন্য ১১ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে এবং অবিলম্বে নির্মাণ কার্য্য শুরু করতে ভূমিপূজাও সম্পন্ন হয়েছে।

এই সংবাদ সকল সুধীজনের জ্ঞাতার্থে অখিল ভারত জয়গুরু সম্প্রদায়ের অছি পরিষদের All India Secretary Prof. (Dr.) Gopal Mitra দ্বারা প্রকাশিত। ইতি—

২৮শে সেপ্টেম্বর ২০১৪ মহামিলন মঠ

নিখিলের আনন্দধারায়

কি ঙ্ক র স মী র ণ

''ওঠ রে জাগ্!

কে গা তুমি?

আমি রে আমি, যাকে তুই ডাকিস, সেই আমি এসেছি, উঠে নাম কর না!''

ঘুমন্ত জীব উঠে পড়েছে।

উঠে পড়েই সে দেখতে চাইছে—সেই ''আমিটাকে'' কিন্তু দেখতে পাচ্ছে না। তাই বারবার প্রশ্ন করছে—কই তুমি? কোথায় তুমি?

শেষ পর্যন্ত বলছে—'আমি যে তোমায় দেখতে পাচ্ছি না! গলায় হতাশার সুর! আপনা আপনি আত্ম-নিবেদন হয়ে যাচ্ছে। শরণাগতি আসছে। আমি যে তোমার, তুমি কেন ধরা দিচ্ছ না? রঙ্গময় সঙ্গে সঙ্গে বলছেন—সে কি রে, বাচ্ছা ছেলেকে বড়'রা যেমন করে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন ঠিক সেই রকম সুর এনে বলছেন—সে কি রে, আমায় দেখতে পাচ্ছিস না?

কানামাছি ভোঁ ভোঁ খেলা চলছে। জীবের চোখ বাঁধা। সে কিছু দেখতে পাচ্ছে না। খেলাটিকে জমাট করার জন্য তিনি বলছেন—''এই যে 'আমি' তোর সম্মুখে রয়েছি, এই যে পার্শ্বে রয়েছি, এই যে পশ্চাতে রয়েছি, ঊর্দ্ধে, অধে, ভিতরে, বাইরে—সর্বত্রই রয়েছি।''

চোখ বাঁধা জীব, দু-হাত বাড়িয়ে খেলা শেষ করার জন্য ছুঁতে চাইছে সীতারামকে। বাতাসের আন্দোলনে সে বুঝতে পারছে—এই আমার পাশ দিয়ে পালালেন উনি। তবু ধরতে পারছে না। বুড়ি ছোঁয়া আর হচ্ছে না। কেবলি হাতড়ে চলেছে।

জীব আকুল নয়নে কাঁদছে। ত্রিতাপের জ্বালায় জ্বলছে। চোখের বাঁধন সে খুলতে চাইছে। কিন্তু পারছে না। এমন একজনকে চাইছে যে ফিসফিস করে, কানে কানে বলে দেবে, এইখানটায় বুড়ি দাঁড়িয়ে, তুই হাত বাড়িয়ে ছুঁয়ে ফেল। সেই একজনই তো হলেন গুরু। যিনি বলবেন, ''আমি তোকে আজ্ঞা করছি, যতক্ষণ তোর জিহ্বা স্ববশ আছে ততক্ষণ তুই অবিরাম নাম কর।'

আবার সন্দেহ, নাম করলে হবে? ধরতে পারবো ''বুড়িকে'' তখনই সে আবার শুনতে পায় 'ফলাফল' শান্তি অশান্তি দেখে কাজ নেই, আমার আদেশ, আমি সন্তুষ্ট হব—তাই জেনে নাম কর।'

জীব ভেতর ভেতর চনমনে হয়। ধূলো ঝেড়ে মাটি থেকে উঠে পড়ে। প্রস্তুত হয়। নাম শুরু করে—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।

হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।।

এমন সময় সে আবার শুনতে পায়—'দেখ তোর মুখে নাম শুনতে বড় মিষ্টি লাগে।'

এটা কার কণ্ঠস্বর? বাবা! না, না, এটা মায়ের গলা। মনটা তার ভেতর ভেতর হুহু করে ওঠে। এবার চোখের ঠুলি খুলে, সরিয়ে রেখে চারদিক তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে—শরতের আকাশে মেঘের খেলা। মা আসছেন, মা আসছেন। চতুর্দিকে শোনা যাচ্ছে—রূপং দেহি, জয়ং দেহি, যশো দেহি, দ্বিষো জহি!

আমায় রূপ দাও, জয় দাও, যশ দাও এবং আমার শত্রু নাশ কর—এ তো বাইরের প্রার্থনা। ভেতরের প্রার্থনা কই? ভেতরের প্রার্থনাকে ধরতে গেলে অর্থগুলোর দিকে তাকাতে হবে—

রূপ্যতে (জোরতে) ইতি রূপম্—আমাকে সেই পরমাত্ম বস্তু দাও।

জয়তি অনেন পরমাত্মনঃ স্বরূপং ইতি জয়ঃ

যেন হৃদয়ে সদা সর্বদা দেবস্মৃতিরাশি জাগরুক থাকে।

যশঃ—শ্রুতি প্রসিদ্ধ তত্ত্বজ্ঞান লাভজনিত যে যশ।

তোমার রূপ দেখতে পারি সেই শক্তি দাও। তোমার জয় গাইতে পারি সেই কণ্ঠ দাও, তোমার কাজে তোমার যশ দেখতে পারি সেই চক্ষু দাও। যেন কাম, ক্রোধ, রূপ জড় রিপুদের মহাশত্রু জ্ঞানে নাশ করতে পারি—হে দেবী তোমার নিকট এই প্রার্থনা ঃ

''ব্রহ্মার্ষি সত্যদেব।''

মহামিলন মঠে রাজ রাজেশ্বরী মা দুর্গা এসে গেছেন। সিংহাসনে বসে হাসছেন। একদিকে মা এসেছেন আর একদিকে মহারাজ, কিঙ্কর বিঠ্ঠল রামানুজজী আকাশমার্গে ওঙ্কারেশ্বর থেকে কোলকাতায় এসেছেন। লোকে লোকারণ্য মহামিলন মঠ। বহুদিন পর মহারাজ ফিরলেন মহামিলন মঠে।

২৭শে সেপ্টেম্বর ট্রাস্টির সভা অনুষ্ঠিত হল। ফুল বেঞ্চ। কেউ অনুপস্থিত নেই। ইন্দোর থেকে এলেন মুকেশজী, কানপুর

থেকে এলেন অমল দা। আলোচ্য বিষয় ছিল ঃ অযোধ্যা, গঙ্গাসাগর, মহামিলন মঠ, ওঙ্কারনাথ সেবা কেন্দ্র, ওঙ্কারনাথ মিশনের অ্যাক্টিভিটি ইত্যাদি।

মুকেশজীর উদ্যোগে দ্বারকার আশ্রমে সংস্কারের কাজ শুরু হয়েছে। ওখানকার বিধায়ক এসেছিলেন আশ্রমে। বিঠুরে অমলদা'র উদ্যোগে চোখের হাসপাতাল খুবই ভালভাবে কাজ করছে। নিত্য জনা পনেরো রুগীর চোখের অপারেশন হয় এখানে।

পরেরদিন। ২৮শে সেপ্টেম্বর শ্রীগুরু মন্দিরের মূল অডিটোরিয়ামে ৯জন ট্রাস্টির এবং ৯০জন সাধারণ সদস্যদের উপস্থিতিতে সাধারণ সভা সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়। সবচেয়ে বড় কথা সর্বংসহা মায়েরা, যাদের স্বভাবে আছে লাবণ্য, তাদের উপস্থিতির সংখ্যা চোখে পড়ার মত। শ্রীহরিনাম দিয়ে সভা শুরু হয়। শ্রীশ্রীঠাকুর কথা হয়। সংঘ মহাসচিব কিঙ্কর সহজানন্দজী (কেওটায় শ্রীশ্রীঠাকুরের আবির্ভাবস্থলে একমাসব্যাপী যে অখণ্ড শ্রীনাম চলছিল তা জয় দিয়ে মঠে এসে) রিপোর্ট পেশ করেন তৎসহ আয়-ব্যয়ের অডিট রিপোর্টও পেশ করা হয়। মহাসচিব সহজ সরলভাবে সকলকে বুঝিয়ে দেন। তারমধ্যে যেমন ছিল কন্যাকুমারী আশ্রমের সংস্কৃত বিদ্যালয় প্রসঙ্গ তেমনি ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত ভেটদ্বারকার আশ্রমের নব রূপায়ণ প্রসঙ্গ। পুরীর নীলাচল আশ্রমের অতিথি নিবাস, অযোধ্যার আশ্রমের সুব্যবস্থার প্রসঙ্গ। হরিনাম দিয়ে সভাশুরু, হরিনামেই সভার সমাপ্তি ঘোষণা।

মঠের দুর্গাপূজার বর্ণনা হয় না। এটা অনুভবের বিষয়, কি সন্ধিপুজো! কি বিজয়াদশমী! কেবল, মা-এর মুখের দিকে চেয়ে বসে থাকো। নইলে বঞ্চিত হতে হবে। মোষের সিং এর উপর একটা সর্ষের দানা যতক্ষণ থাকে সেই সময়টুকুর জন্যেই তো মা আসেন। মৃন্ময়ী প্রতিমা তখন চিন্ময়ী হয়ে ওঠেন। ভক্ত বুঝতে পারেন, মা হাসছেন। আর রবীনদা'র জলদ গম্ভীর স্বরে—

ওঁ কালী করালবদনাং ঘোরাং মুক্তকেশীং চতুর্ভূজাম্।
কালিকাং দক্ষিণাং দিব্যাং মুণ্ডমালা বিভূষিতাম্॥

অপূর্ব লাগে। মাকে যখন কেউ ডাকে তখন শুধু মা এরই মিষ্টি লাগবে কেন, মা এর অন্যসব সন্তানরাও সেই ডাক শুনে স্থির থাকতে পারেন না। তখন সবাই মা,মা,মা, মা,মা,মা, মা,মা, মা করছেন।

বিজয়া দশমীর আর এক সংস্কৃতির রূপ দেখতে পাওয়া যায় মহামিলন মঠে। সিঁদুর খেলা থেকে শান্তিরজল নেওয়া পর্যন্ত—এক অপূর্ব পরিবেশ। কিঙ্কর বিপুলানন্দজীর মাতৃসঙ্গীতে, বিরাগদা'র প্রবচন (সংক্ষিপ্ত) কিঙ্কর সমীরণের স্তোত্রপাঠ আর কিঙ্কর শরণানন্দের শ্রীশ্রীদুর্গাপূজার সঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুরের দুটি লীলা জড়ান ঠাকুরকথা পরিবেশন সকলেই তৃপ্তি ভরে আস্বাদন করেন।

৫ই অক্টোবর। রামপুরহাট গোপাল মন্দিরের অধিগ্রহণের সিদ্ধান্ত সংঘের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। শ্রীশ্রীঠাকুরের একনিষ্ঠা শিষ্যা, সুশিক্ষিতা মিনতি রুজ এর সার্বিক প্রচেষ্টায় এই সুদৃশ্য মন্দির গড়ে ওঠে। স্থানীয় ভক্তবৃন্দের সহযোগিতাও বিশেষ প্রশংসনীয়। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য রামপুরহাটের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী সঞ্জয় কেশরীর নাম। মিনতি রুজ, সঞ্জয় কেশরী এবং আরও কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তি সর্বাধীশজীর দর্শন প্রার্থী হন মন্দিরটিকে অখিল ভারত জয়গুরু সম্প্রদায়ের কাছে সমর্পণের উদ্দেশ্য নিয়ে। আইন বিশেষজ্ঞ একনিষ্ঠ শ্রীগুরুসেবক শ্রীযুক্ত করুণাময় সেনশর্মা সমগ্র ব্যাপারটিকে পর্যালোচনা করে তাঁর সুচিন্তিত অভিমত জানান এবং তারই অনুরোধে সর্বাধীশজী একটি সম্মতিপত্র দিয়ে দেন।

তারাপীঠ থেকে গোপাল মন্দির ছ-সাত কিমি. হবে। স্থানীয় ভক্তদের প্রাণকেন্দ্র হল গোপাল মন্দির। সর্বাধীশজী কিছুকাল আগে নাম, গান ও দীক্ষাদানের মাধ্যমে সংঘ শক্তির গোড়াপত্তন করে এসেছেন। অদূর ভবিষ্যতে বহু জনপ্রিয় মন্দিরটি সংঘের অন্তর্ভুক্ত হলে পরমানন্দের কারণ হবে।

সর্বাধীশজীর বাংলায় একটি দুরন্ত প্রচার পরিক্রমা

বেশ কিছুকাল আগেই বিশ্বখ্যাত তীর্থস্থল নবদ্বীপদামে শ্রীশ্রীঠাকুরের সংঘের অন্তর্গত হয়েছে চৈতন্যধাম নামে গঙ্গার তীরবর্তী একটি মনোরম আশ্রমপীঠ। বিরক্ত সংঘের এক শ্রেষ্ঠ সেবক কিঙ্কর জনার্দনজীর সুপ্রচেষ্টায় সর্বোপরি সংঘ সর্বাধীশ কিঙ্কর বিঠ্ঠল রামানুজ এবং মহাসচিব ডঃ শ্রী গোপাল মিত্রের ঐকান্তিক উৎসাহ ও তত্ত্বাবধানে পাণ্ডাবাবা এবং শ্রীযুক্ত বংশীধর দত্ত প্রভৃতি হৃদয়বান গুরুভক্তের সহযোগিতায় শ্রীবাস অঙ্গনের নিকটবর্তী নয়নতারা ঘাটের উপর নবদ্বীপধামে গড়ে উঠছে চৈতন্যধাম নামে শ্রীশ্রীঠাকুরের ১টি অনবদ্য আশ্রমপীঠ। এই আশ্রমপীঠকে সুসংগঠিত করার জন্যেই সর্বাধীশজীর এবারের এই ঝটিকা সফর।

এই শুভ উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি প্রথম উপস্থিত হন নদীয়ার সুবিখ্যাত ধর্মপ্রাণ শহর শান্তিপুরে। শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অন্যতম শ্রেষ্ঠলীলা পার্ষদ শ্রীশ্রীঅদ্বৈত মহাপ্রভুর বংশ পরম্পরা সুযোগ্য উত্তরাধিকারী এবং বড় গোস্বামী মন্দিরের সর্বজনমান্য সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত পান্নালাল গোস্বামী সাদর আহ্বানে এবং ভক্তশ্রেষ্ঠ শ্রীযুক্ত চাণক্য সেনের সুব্যবস্থাপনায় সর্বাধীশজী ৭ই বিকালে বড় গোস্বামী মন্দিরে একটি সভায় শ্রীশ্রীমহাপ্রভু, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব তথা শ্রীশ্রীঠাকুর এই তিন যুগপুরুষদের ধর্ম মত ও পথ বিষয়ে একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা করেন। তিনি বলেন বিভিন্ন সময়ে তিন অবতার পুরুষ বাংলার বুকে অবতীর্ণ হয়ে সমগ্র জগৎকে সনাতন

অধ্যাত্ম ভাবধারায় পরিপ্লাবিত করেন। যুগ ধর্ম নাম ও প্রণামের উপর সর্বাধীশজী গুরুত্ব আরোপ করেন। মহারাজজী তার বক্তব্যকে সুপরিস্ফুট করবার জন্য যেমন নাম ও প্রণামের দুই লঘু উপায়ের কথা তাদের মহাজীবনী হতে সুপ্রমাণিত করেন, তেমনি সদগুরু যার ভয় কিবা তার ইত্যাদি মধুরাতিমধুর ভক্তিগীতির দ্বারাও শ্রোতৃমণ্ডলীর হৃদয়ে ভক্তি বিশ্বাস সুগ্রন্থিত করেন।

দেড় শতাধিক ভক্তের উপস্থিতিতে ধর্ম সভা জমজমাট হয়ে যায়। ধর্মসভার শেষে একটি মনোরম সভাগৃহে বহু ব্যক্তি সাগ্রহে মহারাজজীর মাধ্যমে শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীচরণে অভয় আশ্রয় লাভ করেন।

৮ই অক্টোবর সর্বাধীশজী সদলবলে শান্তিপুরে বহুখ্যাত ঐতিহাসিক স্থানগুলি দর্শন লাভ করেন যথা শ্রীশ্রীঅদ্বৈত মহাপ্রভুর লীলাস্থল বাবলা সীতানাথপীঠ এবং শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীজীর লীলাস্থল।

৮ই প্রসাদান্তে দুপুর ৩-৪টা নাগাদ কৃষ্ণনগর যাত্রা। কৃষ্ণনগরে গোলাপট্টি অঞ্চলে বিখ্যাত দত্তবাড়ীতে (নীলমণি দত্ত) প্রসাদ তথা বিশ্রামের সুব্যবস্থা হয়। সীতারাম সেবক রতনভাইয়ের সার্বিক প্রচেষ্টায় সন্ধ্যা ৭-৯টা চেতলাঙ্গিয়া মন্দিরে শতাধিক ভক্তের উপস্থিতিতে নাম গান ভাষণ জমজমাট হয়। মহারাজজী প্রধানতঃ শ্রীশ্রীঠাকুরের অতুলনীয় নাম প্রীতি ও মানবপ্রীতির কথা উল্লেখ করেন একইসঙ্গে বলেন আধ্যাত্মিকতা পরমানন্দ লাভের একমাত্র কারণ এবং জাগতিক সুখ বড়ই ক্ষণিক। এই বিষয়ে গভীর আলোচনা করে শ্রীভগবান রামকৃষ্ণদেবের তথা স্বামী বিবেকানন্দের একান্ত প্রিয় গানটি গেয়ে শোনান।

আপনাতে মন আপনি থাকো/ যেও নাক কারও ঘরে। সভান্তে সমাগত ভক্তবৃন্দকে উত্তম প্রসাদ বিতরণের সুব্যবস্থা হয়।

৯ই অক্টোবর সর্বাধীশজী সদলবলে নবদ্বীপ যাত্রা করেন। বিশ্ববিখ্যাত নবদ্বীপধামে শ্রীবাস অঙ্গনের কাছে নয়নতারা ঘাটের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে চৈতন্যধাম ওঙ্কারনাথ মঠ। মন্দিরের কাজ যথাশীঘ্র শুরু করবার প্রচেষ্টায় আছেন সম্প্রদায়ের ট্রাস্টিবৃন্দ এবং স্থানীয় ভক্তবৃন্দ। বিশেষতঃ বিশিষ্ট আশ্রম সেবকদ্বয় কিঙ্কর জনার্দনভাই এবং পাণ্ডাবাবা। সর্বাধীশজী এবারের যাত্রায় মুখ্যত নবদ্বীপ আশ্রমকে আর্থিকভাবে স্বনির্ভর করতে সচেষ্ট হয়েছেন এবং বিভিন্ন স্থানে ভক্তদের উৎসাহিত করছেন তারা যেন নিজনিজ সামর্থ অনুযায়ী নবদ্বীপ আশ্রমে যথাশক্তি সহযোগিতা করেন। সর্বত্রই স্থানীয় ভক্তগণের কাছে এই বিষয়ে বিশেষ আশ্বাস পাওয়া যাচ্ছে। এটি বড় ভরসার। সম্প্রদায়ের ট্রাস্টিগণও আশ্রমের মন্দির নির্মাণকল্পে ১১ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেছেন।

নবদ্বীপ আশ্রমে প্রসাদ এবং বিশ্রামের অন্তে সীতারাম রথ গিয়ে পৌঁছায় সন্ধ্যার ঠিক আগে কালনার গৌরাঙ্গ মঠে। স্থানীয় ভক্তবৃন্দের প্রবল উৎসাহ উদ্দীপনায় কালনার গৌরাঙ্গমঠ নানাভাবে দিনদিন সমৃদ্ধ হয়ে উঠছে। বিশাল নাটমণ্ডপ তথা কালীমন্দির তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ এই বৎসর মঠাধীশ শ্রীযুক্ত মধুদাদা সভাপতি শ্রীযুক্ত মানিক কুমার এবং কোষাধীশ শ্রীযুক্ত প্রভাত রায় প্রভৃতি ভক্তগণের উৎসাহে এবং সর্বাধীশজীর অনুপ্রেরণায় কালনার গৌরাঙ্গমঠে চাতুর্মাস্য নাম যজ্ঞ বিশাল আকার ধারণ করেছে। শ্রীশ্রীঠাকুর ছিলেন নামাবতার তাই নাম যজ্ঞের দ্বারাই তার শ্রেষ্ঠপূজা সম্পন্ন হয়। এই বিশ্বাসে নামযজ্ঞ এইবার বিশাল আকার ধারণ করে। এরপর মহারাজজী একই উদ্দেশ্যে সকলকে নামে প্রোৎসাহিত করেন।

পরবর্তী অনুষ্ঠান—কালনা গৌরাঙ্গমঠ থেকে বেরিয়ে বিখ্যাত গ্রাম শহর বৈদ্যপুর গ্রামের কাছাকাছি একটি নামমন্দির প্রতিষ্ঠাকল্পে বিশিষ্ট ভক্ত তারকনাথ চট্টোপাধ্যায় যথেষ্ট আগ্রহ প্রকাশ করেছেন।

এরপর বিকাল ৪টা নাগাদ কালনা হতে বেরিয়ে আদি আশ্রম ডুমুরদহ শ্রীরামাশ্রম প্রভুর জন্মস্থল কেওটা দর্শনান্তে সর্বাধীশজী ঐদিনই মহামিলন মঠে প্রত্যাবর্তন করেন।

বিজয়া সম্মিলনী

যুবক সংঘের সম্পাদক শ্রীধ্রুব চক্রবর্তী, সবাইকে ফোন করছেন। বিশেষ করে যুবক সংঘের সদস্যদের সে প্রাচীনই হোক্ আর নবীনই হোক্। সুর তো একটাই—

আজ নিখিলের আনন্দধারায় ধুইয়ে দাও
মনের কোণের সব দীনতা মলিনতা ধুইয়ে দাও॥

পরণে সাদা ধুতি আর দেহে হলুদ উত্তরীয়। একে একে সব এসে সীতারাম চরণে মিলিত হলেন। যুবক সংঘের ঘরে মহারাজ প্রবেশ করার সাথে সাথে আনন্দের ঢেউ খেলে গেল। সকলকে আশীর্বাদ করলেন মহারাজ। বললেন, সবাই এখন এক প্রাণ, এক মন হয়ে কাজ করবে। উত্তরোত্তর সম্প্রদায়ের শ্রীবৃদ্ধি ঘটাতে হবে। এবারে মহারাজ ওঙ্কারেশ্বর থেকে ফিরে সংগঠনকে মজবুত করতে প্রায়ই একটা মেসেজ দিতে চাইছেন—রাজনৈতিক দলের যেমন হাইকমাণ্ড থাকে, পলিটবুরো থাকে তেমনি আমাদেরও ট্রাস্টিবডি আছে। ওরা যেমন হাইকমাণ্ডের কথা মেনে চলে তেমনি তোমাদেরও ট্রাস্টিবডির কথা মেনে চলতে হবে। না মানতে পারলে সরে দাঁড়াও, কোনো অসুবিধে নেই। ঠাকুরও কম বড় সাংগঠনিক ছিলেন না। সারা ভারতে ছিয়াত্তরখানা আশ্রমই তার প্রমাণ।

বিকেল হবার একটু আগে থাকতেই ওঙ্কারনাথ মিশনের অনুরাগীবৃন্দ আসতে শুরু করলেন। একদিকে মহারাজকে দর্শন প্রণাম করার আকাংখা অন্যদিকে পরিচিত গুরুভাই বোনেদের সঙ্গে দেখা হবার আনন্দ।

ওঙ্কারনাথ মিশনের সর্ব ভারতীয় সম্পাদক শ্রীদেবীপ্রসাদ চক্রবর্তী সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করলেন। শ্রীনাম দিয়ে শুরু হল অনুষ্ঠান। মৃণাল সাহা হাততালি দিয়ে নাম ধরেন। সেই তালে তাল দিয়ে সকলে গলা মেলান এই নামের মধ্যেই মহারাজ এসে মঞ্চে উঠলেন। বেশ চতুর্দিকে আনন্দের হিল্লোল।

প্রথমেই ওঙ্কারনাথ মিশনের রাজ্য সভাপতি অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি শ্রীউমাপ্রসাদ গাঙ্গুলী ভাষণ দান করেন। ওঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণে বলেন, আমরা ক'জন মিলে (তারমধ্যে সমীরণ দা, দীপক দেবনাথ, মৃণাল সাহা, দিলীপ রায়, দেবীপ্রসাদ চক্রবর্তী ও আমি) মহারাজের নেতৃত্বে ওঙ্কারনাথ মুভমেণ্ট সৃষ্টি হয়। পরবর্তীকালে ওঙ্কারনাথ মুভমেণ্টই ওঙ্কারনাথ মিশনে রূপ নেয়। বর্তমানে ওঙ্কারনাথ মিশনের ওয়ার্কিং প্রেসিডেণ্ট শ্রীনয়ন সাধু মহারাজজীর বক্তব্যকে অনুসরণ করে বলেন, আধ্যাত্মিক জগতে আমরা কারুর থেকে পিছিয়ে নেই। আমাদের কেউ হারাতে পারবে না। দর্শকদের দিকে প্রশ্ন ছুঁড়ে দেন—কেন আমরা ওঙ্কারনাথ মিশন করবো? যদি আধ্যাত্মিকতায় আমরা শতকরা আশি থেকে পঁচাশি পেয়ে থাকি তবে এখনও পনেরো থেকে কুড়ি পারসেন্ট বাকি আছে। আমরা লোককল্যাণ ও সেবামূলক কাজে পিছিয়ে। অন্যান্য সংগঠনগুলো লোককল্যাণে আমাদের থেকে অনেক এগিয়ে। এবারে ওঙ্কারনাথ মিশনের কাজে যেভাবে মায়েরা এগিয়ে এসেছেন তার ভূয়সী প্রশংসা করেন।

শ্রীঅরবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, সহ মঠাধ্যক্ষ, মহামিলন মঠ, বলেন, আসুন মহারাজজীর নেতৃত্বে আমরা মানব কল্যাণে সকলে ঝাঁপিয়ে পড়ি।

প্রদীপ রায়, বিখ্যাত ক্রিকেট খেলোয়াড় পঙ্কজ রায়ের পুত্র, সকলকে প্রণাম জানান। প্রণাম জানান শ্রীশ্রীঠাকুরকে, শ্রীমহারাজজীকে। সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে বলেন, আমরা এসেছি জগতে সেবা করার জন্য—এই কথাটা মনে রাখতে হবে।

দীপক দেবনাথ, ওঙ্কারনাথ মিশনের আদি কোষাধ্যক্ষ, সকলকে প্রণাম জানান, প্রণাম জানান শ্রীশ্রীঠাকুরের চরণে, মহারাজজীর চরণে।

সতীসংঘ থেকে মহুয়াদেবী বলেন, আমাদের সকল কাজের একমাত্র প্রেরণা মহারাজ। মহারাজকে দেখবো মহারাজের সকল কথা শুনবো, মহারাজের কাছ থেকে প্রসাদ পাব—এই তো আমাদের একমাত্র কামনা।

মিঠু সেনগুপ্ত বলেন, মহারাজজী আমাদের প্রাণের প্রাণ, তিনি সকল সময়ে আমাদের রক্ষা করে চলেছেন। মহারাজজীর শরণাগত থাকলেই হবে। আমরা যেন ওর শরণে থাকতে পারি।

জনৈক বন্ধু বললেন, আমরা সকলে সুখ শান্তি চাই। সুখশান্তি পেতে গেলে ধর্ম চাই। আমাদের শরীরটা একটা ঘণ্টার মত। ওপরে ওঙ্কার নিচে অহঙ্কার। অহঙ্কার না গেলে ওঙ্কার পাওয়া যাবে না। এস,এম.এস.-এর একটা ফুল ফর্ম তৈরী করেছেন। এস ফর সংস্কার, এম ফর মনন এস ফর সৎসঙ্গ।

যুবক সংঘের সভাপতি শ্রী অনুপ দাস বলেন, যুবক সংঘ নামপ্রচারের সাথে সাথে সেবামূলক কাজ করে এসেছে। ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ তুলে বলেন, আমি একটা লেখায় প্রশ্ন তুলেছিলাম, ইনি (মহারাজ কে? মহারাজজী তখন বলেছিলেন, এটা আবেগ প্রবণ লেখা। কিন্তু আজ এই কর্মযজ্ঞ দেখে আবারও এই প্রশ্নটা উঠছে—ইনি কে?

জনৈক চিকিৎসাপ্রার্থীকে নয়নঁসাধু মঞ্চে তুলে আনলেন, ভদ্রলোক তো আনন্দে আপ্লুত। বারবার শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম জানাচ্ছেন। প্রণাম জানাচ্ছেন মহারাজকে। গত ২৭শে সেপ্টেম্বর মহামিলন মঠ চক্ষুশিবিরে ওর চোখের ছানি অপারেশনের কথা হয়। ১১ই অক্টোবর শঙ্কর নেত্রালয়ে অপারেশন হয়। এবারে আর একজনের (শিখা মা) রেটিনার অপারেশন হয়। মোট এগারজন বিনামূল্যে এই সুযোগও পান। প্রায় শতাধিক রুগী ঐ শিবিরে যোগ দিয়েছিলেন।

ডাঃ সিদ্ধার্থ চ্যাটার্জীকে দেখা গেল দর্শক আসনের শেষ সারিতে নিরভিমানে মাটিতে বসে মহারাজের ভাষণ শুনতে। ইনিও ওঙ্কারনাথ মিশনের আদিকাল থেকে রয়েছেন। বহু চিকিৎসা শিবির এদের বদান্যতায় উতরে গেছে। বিনামূল্যে কত ওসুধ যে বিতরণ করেছেন! দর্শক আসনে বসেছিলেন ডাঃ করবী চ্যাটার্জী এবং ডাঃ সুভাষ চ্যাটার্জী। করবী দি বিখ্যাত ডেনটিস্ট। আর দাদা হলেন বিখ্যাত সার্জেন। মহারাজ ওদের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন, দাদা হলেন সার্জেন আর আমরা হলাম মেণ্টাল সার্জেন। ওঙ্কারনাথ মিশনের বহু শিবিরে এরা নিয়মিত শ্রমদান করেন। সেবা করেন সেই প্রথমদিন থেকে। করবীদি বললেন, আমরা প্রতিমুহূর্তে ঠাকুরের কৃপা পাই। করবীদি মঠে আসতে ভালবাসেন। যুবক সংঘের সম্পাদক শ্রীধ্রুব চক্রবর্তী বিজয়া সম্মিলনী উপলক্ষে সকলকে প্রণাম জানান যুবকসংঘের পক্ষ থেকে। উনি বলেন মহারাজ এখন যা চাইছেন- আমাদের কাজ করতে হবে দুভাবে- (১) নাম, (২) শিক্ষা ও লোকসেবা।

কিঙ্কর বিরাগানন্দজী, সহ-কোষাধ্যক্ষ, ট্রাস্টিবডি, ওঙ্কারনাথ মিশনের সকল সদস্যদেরঁবিজয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা

জানান। শ্রীশ্রীঠাকুরের আশীর্বাদ প্রদান করেন। প্রসঙ্গক্রমে উনি বলেন সার্দ্ধ ত্রিকোটীবার হরিনাম করা যায়, শাস্ত্রে আছে, তবে আমরা ভগবানকে আমাদের হৃদয় মন্দিরে বসাতে পারবো।

মহামিলন মঠের অধ্যক্ষ কিঙ্কর প্রণবানন্দ (রবীনদা) সকলকে শ্রীশ্রীঠাকুরের আশীর্বাদ জানান। প্রসাদ প্রদানে কোনো ত্রুটি বিচ্যুতি হয়ে থাকলে সকলের কাছে ক্ষমা চেয়ে নেন।

সাঁইবোনা ওঙ্কারনাথ মিশনের সেক্রেটারী দামু ভাই আবেগঘন কণ্ঠে বলেন মহারাজের কাছে দীক্ষা নিয়েছি। ওরই অনুপ্রেরণায় মানবসেবায় ব্রতী হয়েছি। সাঁইবোনা ওঙ্কারনাথ মিশনের অসমাপ্ত বাড়ীটি যাতে দ্রুত সমাপ্ত হয় তার জন্যে ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা জানান। অর্থ সাহায্যের জন্য সকলের কাছে আবেদন করেন। বলেন, ঐ বাড়ীতে নন্দদুলালের কৃপা হলে আমরা একটা চোখের হসপিটাল করবো। আশাকরি পশ্চিমবঙ্গের মানুষ আমাদের পাশে দাঁড়াবে।

বারুইপুরের সতীনাথ চট্টোপাধ্যায় বলেন শ্রীশ্রীঠাকুর জয়াবলীতে বারুইপুর অখণ্ড শ্রীনামের জয় দিচ্ছেন। শ্রীশ্রীঠাকুরই সর্বত্র সূক্ষ্মে কাজ করছেন। চোখ কান খোলা রাখলে আপনাদের সকলের এ অনুভব হবে। কী করে যে কাজগুলো হয়ে চলেছে তা ভাবলেও অবাক হতে হয়। ন'কাঠা জমির উপর বারুইপুরের নতুন আশ্রমটা যেভাবে গড়ে উঠল তা কল্পনারও বাইরে। মহারাজের আশীর্বাদ আমাদের সঙ্গে রয়েছে।

ওঙ্কারনাথ মিশন, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক কিঙ্কর সমীরণ বলেন, সকলকে তপস্বী হতে হবে। তপস্যা করে শক্তি সঞ্চয় করতে হবে। তবেই শ্রীশ্রীঠাকুরের কাজগুলো করা যাবে। শ্রীশ্রীঠাকুরের একটা অনবদ্য বাক্য—''কেহ না রহিবে ক্ষুণ্ণ।'' বিঠ্ঠলজী চেয়েছিলেন, চেয়েছেন ওঙ্কারনাথ মিশন সারা পৃথিবী জুড়ে একদিন বিস্তার লাভ করবে। শ্রীশ্রীঠাকুর তাই কৃপা করেছেন। ইতিমধ্যে বহু জায়গায় ওঙ্কারনাথ মিশনের শাখা গড়ে উঠেছে। বহুদূর গ্রামগঞ্জ থেকে আহ্বান আসছে আমরা জমি দিচ্ছি। আপনারা আসুন, এখানে সীতারামকেন্দ্র গড়ে তুলুন। সাধক হতে হবে। সাধক না হলে শ্রীশ্রীঠাকুর কথা বলতে পারা যাবে না। ছোট ছোট কয়েকটি লীলার কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন উই আর ভেরি মাচ ফরচুনেট, কেন ফরচুনেট? না, শ্রীশ্রীঠাকুর বলছেন যারা মহামিলন মঠে প্রবেশ করেন, আসেন, থাকেন, তাদের সবার মাথাতেই সর্বতীর্থ বারি বর্ষিত হয়। বলেছিলেন, শ্যামসুন্দর-শ্যামরাণী বড় জাগ্রত দেবতা বাবা। বড় জাগ্রত দেবতা। সেবা জন্মগত অধিকার। ইনএট প্রপার্টি। জন্ম থেকেই থাকে। সেবা মনোভাবটাকে বাড়াতে হবে।

একথা সত্য নাম সবার কাছে পৌঁছয়নি। আকাশমার্গে শ্রীনাম নৃত্য করছেন—ঠিক কথা। তবু ভারতবর্ষের দলিত, মুসলমান, প্রান্তিক মানুষেরা এখনও সে নাম গ্রহণ করেন নি। মিশনকে এই দিকে নজর দিতেই হবে। মানুষ তৈরী করতে হবে। আর সেই মানুষ গড়ার কারিগর হতে ওঙ্কারনাথ মিশনের সেবকদের।

সবশেষে মহারাজ বলবেন এমনই ঠিক ছিল। হঠাৎ করে দর্শক আসন থেকে জয়ন্ত মুখোপাধ্যায়কে ডেকে নিলেন। ছোটবেলার বন্ধুস্থানীয়। 'পথের আলো'র লেখক। মহারাজ পরিচয় দিতে গিয়ে বলছেন, হায়ার সেকেণ্ডারীতে নবম হয়েছিল। এরা নামপ্রেমী। শ্রাবণ সংখ্যায় জয়ন্তদা'র লেখা বেরিয়েছিল। সেখানে সোনামণি'দা কে কেন্দ্র করে শ্রীশ্রীঠাকুর যে লীলাটা হয়েছিল সেটা উল্লেখ করেন। মহারাজজী বলেন, সোনামণিদা একজন বিশিষ্ট নামপ্রেমী, একসময় সে গেরুয়া নেওয়ায় শ্রীশ্রীঠাকুর বলেন, ''সোনামণিদা গেরুয়া নিয়েছে, 'একে' ত্যাগ করেছে।'' সোনামণি'দা বলছেন, দ্যাখ ঠাকুর একবার ও বলেননি যে তিনি সোনামণিকে ত্যাগ করেন নি।

এবার জয়ন্তদা চাকরী পেয়ে মাসের প্রথম মাইনেটা ঠাকুরকে দিতে গেলেন। অফিস ফেরতা গেছেন। যতারীতি প্যাণ্ট পরা আছে। সবাই ভাবছে জয়ন্ত বকুনি খাবে, ঠাকুর প্রচণ্ড রেগে যাবেন। কিন্তু কিছুই হল না। উল্টে আদর করলেন খুব।

মহারাজজী শেষ বক্তা। এতক্ষণ ধৈর্য্য ধরে সবার কথাই শুনলেন। বললেন, মূল কথাটা এই সীতারামের প্রচার, প্রসার করতে গেলে আমাদের নাম, পূজা, পাঠ করতে হবে। আমাদের গুরুসেবা অনন্য নিরপেক্ষ সাধন।

তারপর হঠাৎ মিষ্টির প্যাকেটগুলো সরাতে সরাতে হাসছেন, টাকা পয়সাগুলো সরিয়ে বলছেন, দেখ ঠাকুর বলতেন, তোরা কি বোকা এই টাকা পয়সা, মিষ্টির বাক্স এসব দেখেও তোদের সাধু হতে ইচ্ছে করে না? না চাহিতে যশ অর্থ লুটাবে চরণে।

আমার গাড়ী, আমার ছেলে, এসব বলা ছেড়ে দাও। শুধু বল তোমার বাড়ি, তোমার গাড়ী। আমি নয় তুমি, সব তুমি। এখানেই নাম আর প্রণাম। সব গুরু সেবা।

নাম রক্ষার তদবিলে মুক্তহস্তে দান যাতে নামকারীদের একটু যত্ন করা যায়।

নামের মাধ্যমে মানুষ তৈরী করার কাজটি করতে হবে। দায়িত্বটা মিশনকেই নিতে হবে। অখণ্ড নামগুলোকে ঠিকমত রক্ষা করতে পারলেই আমাদের কাজটা সহজ হবে। মঠে এসেই নামের কাছে বস, নাম কর, নাম শোন, যত নাম তত আনন্দ।

গোপালবাড়ি

কি ঙ্ক রী স্নি গ্ধা সা ম ন্ত

হে অন্তরযামী
অন্তর মাঝে বোসে আছো তুমি
হে অন্তরযামী
কৃপা কর মোরে হে সীতারাম
জীবনে মোর ব্রত হয় যেন নাম
এই গৃহ হোক তোমাদেরই মন্দির
তাতেই মোদের মন যেন থাকে স্থির
মন্দির হোক তব আনন্দ ধাম
সবাই করুক সেথা কৃষ্ণ কৃষ্ণ নাম
অন্তরে জ্বালাও তুমি প্রেমের উজ্জ্বল বাতি
সেই আলোতে করি গো আমি তোমারি আরতি
মন্ত্র তন্ত্র জপ জানিনা জানি শুধু নাম
সেই নামে পবিত্র হোক এই আনন্দধাম
গুরুকৃপা যে পায় সে হয় উদ্ধার
জীবনে আর কিছুই লাগে না যে তার
জীবনে যা কিছু পাওয়া
সবই তো তোমারই দেওয়া
তোমারই কাছে পাওয়া
না চাহিতে প্রভু দিয়েছো দুহাত ভরে
জানি না কতটুকু পারি করিতে তোমার তরে
তবুও স্নেহের ডোরে রেখেছো বুকে ধরে
নিয়েছ আমায় তুমি আপন করে
আমার আমির তুমি কর অবসান
তোমাতে সমর্পিত হোক মোর প্রাণ
এই মিনতিটুকু করি গো তোমায়
যাবার বেলায় দেখা তুমি দিওগো আমায়
হে অন্তরযামী
অন্তর মাঝে বোসে আছো তুমি।

মায়েরা

(ব্রহ্মচারিণী ত্যাগী মায়েরা)

কি ঙ্ক রী উ মা

জাহ্নবী লইয়া শিরে **পদ্মে**র মৃণালপরে
উমাপতি শোভিছে সুন্দর।
রমণীয় কলেবরে **শ্যাম**কান্তি-শিরোপরে
ভারতের **বাণী**ময় এসেছে অমর।
ক্ষমিতে আপনজনে **শান্তি**র পথ বাহি
স্বলোক ত্যজিয়া আজি এসেছে **ঠাকু**র নামি,
রাধার ব্যাথার ছলে আপন **মর্ম্মবা**ণী
শ্রীনামের মাঝখানে আসন পাতিয়া,
প্রেমময় রূপ ধরি শোনায় মধুর ধ্বনি
দিক হতে দিগন্তের শ্রবণে মিশিয়া।
সদাই-ধ্বনিত হয় প্রণবের বেদধ্বনি
সততই হৃদিমাঝে বাজিছে ঝংকার,
নিয়ত শোনায় **বীনা** যে মধুর অনুরানি
কি জানি কিসের ধ্বনি কি সুর নেশার?

(ঠাকুরের মায়েদের তিনি নাম দিয়েছিলেন তাদের নাম দিয়ে লেখা কবিতা)

ওঙ্কারলোকে "অনিলের ব্যাটা দিলীপ"

কিঙ্কর সমীরণ

কতদিন আগেকার কথা। তখন আর বয়স কত? এক রোববারের বিকেল। হঠাৎ প্রায় পঁচিশ-ত্রিশজনের একটি দল হরিনাম করতে করতে আমাদের বাড়ী ঢুকলেন। একজনের বুকে শ্রীশ্রীঠাকুর সীতারামদাস ওঙ্কারনাথদেবের চিত্রপট, পরমগুরুদেবের চিত্রপট সব রয়েছে। বেশ মনে আছে আমাদের দোতলার ঘরটা বেশ বড়। বিশেষ সে রকম কোন ফার্ণিচারও ছিল না। আগেকার দিনের একটা চৌকী। মুহূর্তে তোলা যায় আবার মুহূর্তে নামিয়ে ফেলা যায়। খুব জোর নাম হল। গলির লোকজনেরা সব বেড়িয়ে এলেন। প্রত্যেকেই করজোড়ে নামকে প্রণাম করলেন। পরে শুনলাম, এদের বলে পার্কের নামকারী। টালাপার্কের গুমটিঘরে এরা এসেছিলেন নাম করতে। সেখান থেকে পিসেমশাই (ভুবনেশ্বর রায়চৌধুরী, সুব্রত রায়চৌধুরীর পিতৃদেব) এদের আবাহন করে নিয়ে এসেছেন। সেই সময় আমি কাকেই বা চিনি আর কাকেই বা দেখেছি। যতদূর মনে পড়ছে আমাদের বাড়ীতে সেই প্রথম শ্রীনামের পদধূলি প্রাপ্তি। এর আগে বাবাকে শুধু একা একা করতাল বাজিয়ে নাম করতে দেখেছি। স্নান করে ঠাকুরঘরে গিয়ে একটু জপ করেই করতাল বাজিয়ে নাম করতেন। বহুদূর থেকে সেই করতালের ধ্বনি শোনা যেত। তখন থেকেই 'পার্কের নামকারী' শুনলে ভেতরটা কেমন আনন্দে ভরে যায়।

আবার সেই আনন্দটাই পেলাম। গত ২৪শে আগষ্ট রোববার শ্রীনাম এলেন শ্রীঠাকুরের অনাথ দেব লেনের বাড়ীতে। বেশ আনন্দেই ভাসছিলাম। হঠাৎ করে হিমাংশুদা'র মুখে শুনলাম দিলীপদা দেহ ছেড়ে দিয়েছেন। উত্তর কোলকাতার একজন বিশিষ্ট পার্কের নামকারী দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায় গত ৫ই আগষ্ট, মঙ্গলবার দিন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। রাত্রে। মনটা একটু বিষণ্ণ হল। সব ছবিগুলো ভেসে উঠতে লাগলো।

কলেজ স্ট্রীট দিয়ে ঢুকতে হত প্রেমচাঁদ বড়াল স্ট্রীটে। সামনের মন্দিরটা ফেলে কয়েকটা বাড়ী এগুলেই দিলীপদার বাড়ী। সম্ভবত 'জয়গুরু' পত্রিকার জন্যে লেখা আনতে গেছিলাম। দোতলার ঘরে গিয়ে একটা চেয়ারে বসে আছি। সামনের দেওয়ালে একটা মাত্র ছবি। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছি। এক্কেবারে হুবহু আনন্দময়ী মা। 'কি দেখছেন? আমার গর্ভধারিণী। এক্কেবারে আনন্দময়ী মায়ের মত দেখতে, না? —দিলীপদা বললেন।

সত্যি, কেউ যদি না বলে দেয়, তবে যে কেউ ভুল করবেন। যে বাড়ীতে দিলীপদা থাকতেন সেই বাড়ীটা ছিল ভাড়া বাড়ী। শ্রীশ্রীঠাকুর বেশ কয়েকবার ঐ বাড়ীতে পদধূলি দিয়েছিলেন। তাই দিলীপদার বড় ইচ্ছে ছিল ঐ বাড়ীটা নিজস্ব হোক। কিন্তু কিছুতেই কিছু হচ্ছে না। শেষ পর্যন্ত শ্রীশ্রীঠাকুর দিলীপদা'র মনোবাসনা পূরণ করেন।

দিলীপদা'র কাজ ছিল উত্তর কোলকাতার কোন কোন পার্কে, কবে কোথায় নাম হবে তার তালিকা তৈরী করা। সত্যধর্ম প্রচার সংঘের পূজা পার্বণগুলোর তালিকা তৈরী করে সমস্ত সেবকদের জানিয়ে দেওয়া। 'পথের আলো', 'জয়গুরু'র দপ্তরে সেই সাইক্লোস্টাইল কপি পাঠিয়ে দেওয়া। যাতে সম্প্রদায়ের সমস্ত অনুরাগীবৃন্দ তিথিগুলো সম্পর্কে সচেতন থাকতে পারেন। এবং পালন করতে পারেন।

যৌবনে দিলীপদা একজন বীর ভক্ত ছিলেন। দুমদাম শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রশ্ন করে বসতেন। আর যা বলতেন তার মধ্যে একটা দৃঢ়তা থাকত। শ্রীশ্রীঠাকুর হয়তো কোথাও বলছেন, গুরুই হল শ্রেষ্ঠ। গুরুকে স্মরণ করে কাজ করলে আর কিছুই করার দরকার নেই। পরেরদিন আবার হয়তো কোথাও বলছেন নাম কর, অবিরাম নাম কর, তাহলেই হবে।

দিলীপদা শ্রীশ্রীঠাকুরকে বলে বসলেন, তোমার কথার কোনটা ঠিক?

শ্রীশ্রীঠাকুর হেসে সরে গেলেন।

সেবার বালির কেদার ভবনে শ্রীশ্রীঠাকুর রয়েছেন, শ্রদ্ধেয় পদ্মলোচনদা সামনে দাঁড়িয়ে, দিলীপদা শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে গিয়ে বললেন আমায় ইষ্ট দর্শন করাও।

উনি দেখলেন জ্যোতির্ময় ইষ্টকে শ্রীশ্রীঠাকুরের মধ্যে। পদ্মলোচনদা তাই দেখে বিস্ময়াভিভূত হয়ে গেলেন। বললেন, এখনও মুখ থেকে দুধের গন্ধ যায়নি, এরই মধ্যে এত। কাউকে প্রকাশ করিস না।

জ্যোতিষী কুষ্ঠি বিচার করে বলেছিলেন, অষ্টমে শনি, অবশ্যই ইষ্টদর্শন হবে আর দীর্ঘায়ু যোগ। তা ইষ্টদর্শনও হল আর দীর্ঘায়ুও পেলেন দিলীপদা। একবার দিলীপদা খুব অসুস্থ। বলতে গেলে মৃত্যুপথযাত্রী। সম্ভবত শ্রীশ্রীঠাকুর তখন ওঙ্কারেশ্বরে। ধীরেন দা গিয়ে ঠাকুরকে দিলীপদার অসুস্থতার খবরটি বলেন। সুস্থ হবার পর দিলীপদা শ্রীশ্রীঠাকুরের সামনে হাজির হয়েছেন। ঠাকুরকে সেই সময়কার অনুভবের কথা বলছেন, দেখলাম কালো কালো সব যমদূতগুলো নিতে এসেছে এমন সময় তুমি এসে আমাকে বাঁচালে।

সেই শুনে ঠাকুর বগল বাজিয়ে ঘুরতে লাগলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের নিয়ম প্রসাদ পরিবেশন করবে ব্রাহ্মণরা, ভোগ রন্ধন করবে ব্রাহ্মণরা। এমনকি প্রসাদ পাবার সময় একদিকে ব্রাহ্মণ বসবে আর একদিকে অব্রাহ্মণরা বসবেন। এ ত আর কাঙালী ভোজন নয়, প্রসাদ পাবার ব্যাপার। যারা প্রসাদ পেতে চান তাদেরকে প্রসাদ পাবার মত করেই পেতে হবে। কোন একটা জায়গায় শ্রীশ্রীঠাকুর রয়েছেন। লোকজনও অনেক। অথচ পরিবেশনের ব্রাহ্মণ নেই। কেউ একজন দিলীপদাকে ধরেছে পরিবেশন করার জন্যে। কোন কিছু বলার আগেই শ্রীশ্রীঠাকুর চুপিচুপি জিজ্ঞেস করলেন, 'হ্যাঁরে প্রসাব করে চারবার ধুস্ তো।'

শ্রীশ্রীঠাকুরকে দিলীপদা একবার জিজ্ঞেস করেন, 'তুমি যে এত মঠ মন্দির বানিয়ে যাচ্ছ রাখতে পারবে তো?'

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন, 'চেষ্টা তো করছি।'

বহু ভুগেছেন ঐ শরীর নিয়ে। দিলীপদা'র পেটে ভয়ানক যন্ত্রণা শুরু হল। কোনো ডাক্তারই কিছু করতে পারে না। শেষে ডাঃ বিধান রায়ের শরণাপন্ন হলেন। বিধান রায় সব দেখেশুনে বললেন, পেটে একটা বড় অপারেশন করাতে হবে। শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে খবর গেল। শ্রীশ্রীঠাকুর বলে পাঠালেন দিলীপকে ওঙ্কারেশ্বরে নিয়ে আয়। সেই শুনে দিলীপদার পিতৃদেব অনিল বন্দ্যোপাধ্যায় জীতেন মুখোপাধ্যায়ের শরণাপন্ন হলেন। জীতেনদাকে বললেন, দিলীপ তো জল খেলেই বমি করে দেয়, কি করে যাবে? জীতেনদা বললেন, ঠাকুর ডেকেছেন, ও জল খেয়েই যাবে।

ওঙ্কারেশ্বরে যাবার পর ঠাকুর বললেন, হ্যাঁরে ডাক্তার দেখিয়েছিস? দিলীপদা বললেন, বিধান রায়কে তো দেখিয়েছি, আর কাকে দেখাবো? সেই শুনে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন, 'ব্রাহ্মণের পাদোদক খাবি।' 'জগতের তুমিই তো একমাত্র ব্রাহ্মণ, আর ব্রাহ্মণ কোথায় পাব? শুনে বললেন এখানে যতদিন আছিস এর পাদোদক খাবি, প্রসাদ খাবি, বাড়ী গিয়ে বাবার পাদোদক খাবি আর হবিষ্যি করবি।

শ্রীশ্রীঠাকুর ওঙ্কারেশ্বর থেকে ফিরলেন। নেমেই জিজ্ঞেস করলেন (দিলীপের) বায়োপসি করা হয়েছিল?

কর গুণে গুণে কয়েকটা জিনিস খেতে নিষেধ করলেন। কয়েকদিন পরই দিলীপদা ডাঃ বিধান রায়ের কাছ গেলেন চেক-আপ করাতে। সবচেয়ে আশ্চর্য্যের বিষয় হল বিধান রায় ঠিক আঙ্গুলের কর গুণে গুণে বললেন, এই এই জিনিসগুলো খাবে না।

দিলীপদা জীবনের শেষদিন পর্যন্ত শ্রীশ্রীঠাকুরের নির্দেশগুলো অক্ষরে অক্ষরে মেনে এসেছেন। পার্কের নামে নিয়মিত আসতেন। শরীর যতদিন সুস্থ ছিল পার্কের নামে ঠিক উপস্থিত হতেন। একদিন কথাচ্ছলে হিমাংশুদা (রায়) কে বলছেন, **'দ্যাখ হিমাংশু, যদি পার্কের নামে না আসতে পারি তাহলে বেঁচে থেকে কি লাভ?'**

মহামিলন মঠে শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দর, শ্রীশ্রীশ্যামরাণীর প্রতিষ্ঠা হল। মন্দিরে সকলে উপস্থিত আছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর রয়েছেন, সত্যধর্ম প্রচার সংঘের সব দাদারা রয়েছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর শ্যামসুন্দরকে দেখিয়ে বললেন, বড় জাগ্রত দেবতা বাবা, বড় জাগ্রত দেবতা বাবা, তোদের মনে সুবিধে অসুবিধে যা উঠবে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে জানিয়ে দিবি হয়ে যাবে। দিলীপদাকে বললেন, তোরা তো একে সব সময় পাস না, তোদের যা কিছু সব কিছু জানাবি। দিলীপদাকে শ্রীশ্রীঠাকুর খুব স্নেহ করতেন। ডাকতেন, অনিলের ব্যাটা দিলীপ বলে। একবার ডাকলেন, অনিলের ব্যাটা দিলীপ হ্যাঁরে তোর বাপটা কেমন আছে রে?

অনিলদা'র শরীর তখন খুবই অসুস্থ। ঠাকুর সব শুনে আশীর্বাদ জানালেন। আশ্চর্যের ব্যাপার আশীর্বাদ প্রাপ্তির পর থেকে অনিলদার শরীর সুস্থ হতে আরম্ভ করল।

দিলীপদা'র তখন সবে দীক্ষা হয়েছে। জিজ্ঞেস করলেন, হ্যাঁরে তোর নাম কি?

সঙ্গে সঙ্গে দিলীপদা'র সপ্রতিভ উত্তর—তুমি নাম মনে রাখতে পারনা (তাহলে) গুরু হয়েছ কি করতে?

তারপর থেকে শ্রীশ্রীঠাকুর আর কোনোদিন দিলীপদাকে নাম জিজ্ঞেস করেন নি। কোনো দরকার পড়লে বলতেন, অনিলের ব্যাটা দিলীপ। শ্রীশ্রীঠাকুর দক্ষিণেশ্বরের গঙ্গায় গেছেন। স্নান করবেন। নেমে গেছেন জলে। আর পাড়ে দিলীপদা ছোট্ট ছেলেটির মত শ্রীশ্রীঠাকুরের কাপড় চোপড় ধরে বসে আছেন।

জীতেনদা'ই দিলীপদাকে মহাকরণে চাকরীটা করে দেন। যে পোস্টে চাকরী করতেন সেখানে টাকা আকাশে উড়ত। সবচেয়ে অবাক কাণ্ড দিলীপদা একটা পয়সাও ঘুষ নেননি কখনও। কাউকে তোষামোদিও করতে পারতেন না। কেউ কেউ ভেবেছেন দিলীপদা একজন ভাল ব্রাহ্মণ, তা একটু দান দিই। দিলীপদা পারতপক্ষে কোন দানই গ্রহণ করতেন না। যদি বা কখনও কোথাও অনুরোধে ঢেঁকি গিলতে হয়েছে পরবর্তীকালে উনি আবার দান করে মুক্তি পেয়েছেন।

এক জায়গায় ঠাকুর রয়েছেন। সেখানে প্রসাদের আয়োজন সে রকম ছিল না। দিলীপদা'রা সকলে শ্রীশ্রীঠাকুর সন্দর্শনে গেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর ওদের ডেকে বললেন, 'তোরা এর কাছে এসেছিস্, রুকো-সুকো যা জুটবে পেট ভরে খেয়ে নিস।'

পুরীতে গেছেন সকলে মিলে। শ্রীশ্রীঠাকুর তখন মৌন। এদিকে শ্রীনামমঞ্চে তানপুরাদা (অনিল চক্রবর্তী, সলিল চক্রবর্তীর পিতৃদেব) নাম করে চলেছেন। সে কি শ্রীনামের প্লাবন বইছে। তানপুরাদা নাম বন্ধ করতে পারছেন না, অবশভাবে নাম করে চলেছেন। চোখের জলে বুক ভাসছে। শ্রীশ্রীঠাকুর মৌন কুটীর থেকে বেড়িয়ে এসে তানপুরাদাকে জড়িয়ে ধরলেন। অবশেষে শ্রীনাম বিশ্রাম নিলেন।

দিলীপদা ছিলেন শ্রীঠাকুর অন্ত প্রাণ। ঠাকুরের প্রতি তাঁর নির্ভরতা ছিল অনবদ্য। ঠাকুরকে যে ভাবে, একান্তভাবে প্রণাম করতেন সেটাও দেখবার মত ছিল। খুবই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ প্রণাম। শ্রীশ্রীঠাকুরও তেমনি চরণদুটি জোর করে চেপে ধরতেন। আর তার মাধ্যমেই শক্তি সঞ্চার হয়ে যেত।

যখন মহামিলন মঠ হয়নি, সত্যধর্ম প্রচার সংঘের সেবকরা আপ্রাণ পরিশ্রম করছেন। সকলেই তখন এক প্রাণ, এক মন। সামনের সারিয়ে তখন রয়েছেন জীতেনদা, ভূপেশদা, রাসদা, প্রত্যেকেই শ্রীশ্রীঠাকুরের ভক্তবৃন্দকে নিয়মিত অনুপ্রাণিত করে চলেছেন। সেবামূলক মনোভাব যাতে ঠাকুরের সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে জাগরিত হয় তার জন্যে সচেষ্ট থাকতেন। মহামিলন মঠের সেবা কাজে এদের অংশগ্রহণ এক অবিস্মরণীয় ঘটনা। দিগসুই-এর দীনবন্ধুদা, শঙ্করদা এদের স্থান কেউ আর পূরণ করতে পারবেন না। কেদার ভবন (বালি) তে যখন শ্রীশ্রীঠাকুর আসতেন তখন লক্ষ্মীমা'র সেবা অতুলনীয়।

একবার শ্রীশ্রীঠাকুর ঘরে রয়েছেন। সকাল থেকেই কারুর সঙ্গে কথা বলছেন না। গম্ভীরভাবে রয়েছেন। এদিকে কোলকাতা থেকে দিলীপদা গিয়ে হাজির। সটান শ্রীশ্রীঠাকুরের ঘরে। কত কথাই শ্রীশ্রীঠাকুর দিলীপদা'র সঙ্গে বললেন।

ঘর থেকে বেড়িয়ে এলেন দিলীপদা। তৃপ্তির ছাপ চোখেমুখে। পদ্মলোচনদার ভাই সুশীলদা দিলীপদা'কে বলছেন, হ্যাঁরে দিলীপ! ঠাকুর আজ সারাদিন কারুর সঙ্গে কথা বলেন নি, তোর সঙ্গে শুধু কথা হল।

দিলীপদা দেখছেন শ্রদ্ধেয় জীতেনদা অবিস্মরণীয়ভাবে সেবা করে চলেছেন মহাকরণ থেকে। যার জীতেনদা'র সংস্পর্শে আসছেন তাদের দিয়ে কাজ করিয়ে নিচ্ছেন।

কোন এক রথের দিন শ্রীশ্রীঠাকুর দিলীপদা'র বাড়ীতে এসেছেন। ফলপ্রসাদ গ্রহণ করেছেন। ফেরবার সময় হঠাৎ বললেন, 'যারা মহামিলন মঠে রথের রশি টানতে চাও এর সঙ্গে, মঠে এস।'

হুড়মুড় করে সব ঠাকুরের পেছন পেছন ছুটল মহামিলন মঠে। সম্ভবত ঐদিন কিংবা অন্য আর একদিন। শ্রীশ্রীঠাকুর দিলীপদা'র বাড়ীতে। শ্রদ্ধেয় ধ্যানদা উত্তেজনায় ডগমগ করতে করতে শ্রীশ্রীঠাকুরের সামনে হাজির।

—বাবা! বাবা!

শ্রীশ্রীঠাকুর উৎসুক নেত্রে তাকালেন ধ্যানদা'র দিকে। চাহনিতে প্রশ্ন কি হয়েছে?

—বাবা! দি-লী-প একটা বড় কাজ করেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর জিজ্ঞেস করলেন চাহনিতে—কি কাজ করেছে?

—বাবা, বাবা, দিলীপ একটা বড় কাজ করেছে—দীনবন্ধুদা'র ছবি রেখেছে।

সম্প্রদায়ের প্রথম সর্বাধীশ। ডাঃ দীনবন্ধু ঘোষ। কোলকাতা মেডিকেল কলেজের ছাত্র। মগরা, দিগসুই এর ধন্বন্তরি ডাক্তার। বিনয়ে সেবায়, সবাধীশ নয়, সর্বাধীন। কেবল বলতেন, জপাৎ সিদ্ধি is equal to ঝপাৎ সিদ্ধি!

ধ্যানদাকে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন, 'প্রণাম কর, প্রণাম কর।' দীনবন্ধুদা পরমগুরুবাড়ীর বহু সেবা করতেন বলে শ্রীশ্রীঠাকুর খুব প্রসন্ন ছিলেন।

রাসগোপালদাও পার্কের নামে নিয়মিত অংশগ্রহণকারী ছিলেন। রাসগোপালদাও নিজের জীবিকার প্রতি একনিষ্ঠ থেকেও গুরুভাই-বোনেদের শ্রীশ্রীঠাকুরের কাজে খুব উদ্বুদ্ধ করতেন। এরা সব এক একজন চিহ্নিত সন্তান। লোক আকর্ষণকারী সেবক। শ্রীশ্রীঠাকুরের ভক্তদের বলতেন, 'পয়সা নেই! অত সময় নেই! তোরা শরীর দিয়ে সেবা কর,' বহু লোক সে সময় রাসগোপালদা'র সঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবা করে প্রভূত আনন্দ পেয়েছেন দিলীপদা'র সঙ্গে রাসগোপালদা'র একটা আন্তরিক বন্ধন ছিল। দিলীপদা চেষ্টা করতেন সৎ ব্রাহ্মণের নিয়ম পালন করতে। পারতপক্ষে কারুর কোন দান নিতেন না বা নিতে চাইতেন না।

একবার শ্রদ্ধেয় ভারতবিখ্যাত চিকিৎসক ডাঃ নলিনী রঞ্জন সেনগুপ্ত এসেছেন শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে। দর্শনপ্রার্থী হয়ে। এদিকে শ্রীশ্রীঠাকুর শুয়ে আছেন তো শুয়েই আছেন। ওঠার আর নাম করছেন না। যারা অপেক্ষমান তাদের নিজেদের মধ্যে শ্রীশ্রীঠাকুরকে নিয়ে আলোচনা শুরু হয়ে গেল। আর যেখানে ডাক্তারবাবু রয়েছেন স্বাভাবিকভাবে তিনিই তো হবেন মধ্যমণি। ডাক্তারবাবু বলছেন, সীতারামের স্বল্প আহার, সামান্য পায়খানা এসব নিয়ে আলোচনা চলছে। হঠাৎ দিলীপদা ওর মধ্যে বলে বসলেন, সাধকদের এই রকমই হয়। শ্রীশ্রীঠাকুর যে সাক্ষাৎ ভগবান—এরকম কিছু আরও বলেছিলেন। দিলীপদা'র মুখে ঐরকম কথা শুনে ডাক্তারবাবু তো একটু অবাক। ছোট ছেলে। সে কি বলছে!

এবার ঠাকুর উঠলেন ঘুম থেকে। দিলীপদা'র হাত ধরলেন। ডাক্তারবাবু হাসতে হাসতে সীতারামকে দিলীপদা সম্বন্ধে ইঙ্গিতে কিছু বললেন, শুধু শোনা গেল—'এই ছেলেটি!'

শ্রীশ্রীঠাকুর মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন। কোন কিছু অস্বীকার করলেন না।

ঐসময় একদিন প্রখ্যাত অধ্যাপক শ্রীকুমারবাবু এসেছেন শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে। শ্রীশ্রীঠাকুর তো খুব আদর আপ্যায়ণ করলেন। স্নেহ করলেন। শ্রীকুমারবাবু তো খুবই আনন্দিত, তৃপ্ত। সম্ভবত এর পরেরদিনই আবার এলেন শ্রীকুমারবাবু। শ্রীঠাকুর দর্শনে। সেদিন কিন্তু ঠাকুর একদম চিনতেই পারলেন না। ফলে শ্রীকুমারবাবুর চোখের জলে বুক ভেসে গেল। এক রাশ অভিমান বুকে করে নিয়ে বাড়ী ফিরলেন। তারপর আবার একদিন ঠাকুরের কৃপা পেলেন।

দিলীপদা একটা কথা বলতেন। যেখানেই ঠাকুর সেখানেই শ্যামল। হাওড়ার শ্যামল বোস। যার বাড়ীতে দুর্গাপুজো দেখে শ্রীশ্রীঠাকুর বলেছিলেন, 'দেশলাই-এর বাক্সে দুর্গাপুজো দেখে যা।'

একজন প্রায়ই শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে আসতেন। একদিন ঠাকুর তাকে প্রশ্ন করে বসলেন, হ্যাঁরে তোর কাজ নেই? তুই অফিসে না গিয়ে এখানে আসিস কেন?

পরে জানা গেল অফিসে ওর গোলমাল ছিল। শ্রীশ্রীঠাকুর সকলকে জানিয়ে দিলেন কার্য্যসিদ্ধির জন্যে কেউ যেন সুপারিশ না করে।

মৃত্যু হল দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের। মৃত্যু হল অনিলের ব্যাটা দিলীপের। প্রকৃতির নিয়মে দিলীপদার দেহভাণ্ড থেকে প্রাণপুরুষ বেড়িয়ে পড়লেন। পার্কের নামের উপর বড় টান ছিল। আবার হয়তো দিলীপদার ভেতরকার চিদপুরুষ ঐ সেবার টানে দেহধারণ করবেন, তখনই তাঁর হবে আবার জন্মগ্রহণ। প্রতিটি জন্মগ্রহণে, প্রতিবার দেহধারণে প্রতিবারই আমাদের সূক্ষ্মশরীরে ক্রমাগত শুদ্ধ হতে থাকে। শুদ্ধ থেকে শুদ্ধতর। বালির কেদার ভবনের একটা লীলা দিয়ে শেষ করি। পদ্মলোচন দা'র হাই-ব্লাড সুগার। পদ্মলোচনদা'র মাতৃদেবীর এ দিলীপদার প্রতি প্রবল অপত্য স্নেহ ছিল। একদিন বললেন, 'হ্যাঁরে দিলীপ! ছেলেটাকে (পদ্মলোচনদা) ভাত খাওয়াতে পারি না, তুই একটু এদের সঙ্গে বসে ভাত খা।'

আজ দু'জনের কেউ রইলেন না। কেউ ভাত খেতেও বলবে না, কেউ ভাত খাবেও না।

জয়গুরু

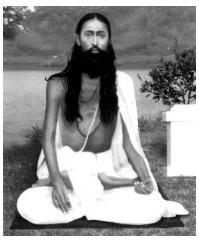

পরমগুরুদেব দাঁশরথিদেব যোগেশ্বরের আশীর্বাণী

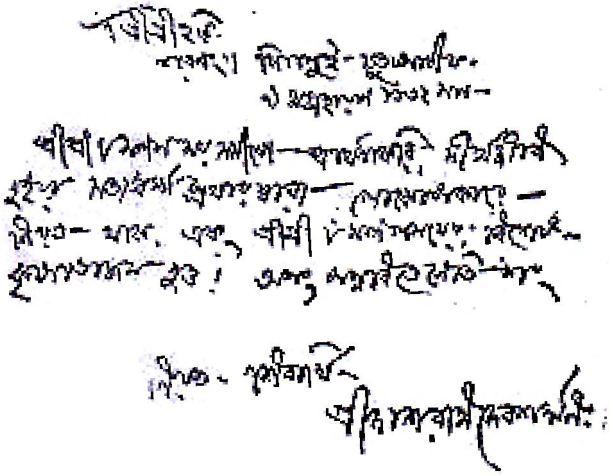

জয়গুরু

মাসিক মিলন পত্র

সকৃদেব প্রপন্নায় তবাস্মীতি চ যাচতে।
অভয়ং সর্ব্বভূতেভ্যো দদাম্যেতদ্ ব্রতং মম॥

শ্রাবণ, ১৪২১ চতুর্থ সংখ্যা

সূচী ঃ

● **সঙ্গের ছিন্ন স্মৃতি** □ প্রসাদচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ২৪৪ ● **ভক্তের ভগবান** □ বারীন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায় ২৪৮
● **মিলন যজ্ঞে** □ পুরঞ্জয় রায় বন্দ্যোপাধ্যায় ২৫০

সঙ্গের ছিন্ন স্মৃতি

প্র সা দ চ ন্দ্র মু খো পা ধ্যা য়

৩১শে ভাদ্র, ১৩৬৬—আজও গত কয়েক দিনের মত বাবা প্রভাতে নাম মহিমা কীর্ত্তন করালেন। ৯টার সময় ২য় প্রহরের সংকীর্ত্তন হল। মন্দির হতে ফিরে বাবা কয়েকজনকে দীক্ষা দিলেন। অপরাহ্ন ৩টার মধ্যে আরও ২বার নামমহিমা সংকীর্ত্তন হল।

আজ বাবার পাঠে বসতে সন্ধ্যা হ'য়ে গেল। বাবা প্রথমে ভাষণ দিলেন, বললেন ঃ —আমরা সকলেই ভূমা আনন্দ চাই; কিন্তু বিষয় আনন্দে মজে গিয়ে পরমানন্দের কথা ভুলে যাই। বিষয়ানন্দে বিরহ আছে, জ্বালাও আছে; পরন্তু পরমানন্দে বিরহ নাই, জ্বালা যন্ত্রণাও নাই। এ আনন্দে পৌঁছান যায় কি করে? না, বিষয় সুখ ত্যাগ করলে। ত্যাগ কি করে করা যায়, চোখ উপ্‌ড়ে ফেলবো, না নাক কান বন্ধ করবো? না, তা নয়, ইন্দ্রিয়গুলির বিষয় মুখ থেকে ফিরিয়ে ভগবন্‌মুখী করতে হবে। যেমন চোখ সুন্দর রমণী দেখতে চায়, তাকে ভগবানের রূপ দেখাও। কর্ণ মিষ্ট গান শুনতে চায়। তাকে ভগবন্নাম শোনাও। নাসিকা সুগন্ধ আঘ্রাণ করতে চায়, তাকে ভগবানের চরণ তুলসীর আঘ্রাণ নিতে দাও। এইরূপে পাঁচটি ইন্দ্রিয় ও মনকে ভগবানের কাজে, নামে ও চিন্তায় লাগিয়ে দাও। মনকে নিয়েই একটু মুস্কিল। 'চঞ্চল হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ম্।' ভগবান অর্জ্জুনকে বলছেন মন চঞ্চল বলবান ও অনমনীয়। তবে উপায়! না, উপায় আছে। অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় ঃ —অভ্যাসের দ্বারা, ভগবানের আরাধনা, ধ্যান, জপ ও নাম সংকীর্ত্তন রূপ অভ্যাসের দ্বারা চঞ্চল মন স্থির হবে। মনস্থির হলেই পরমানন্দ।

'প্রপন্ন পথিক' থেকেও কিছু পাঠ করলেন। বললেন ভগবানের সহিত কথা কইতে হয়। উত্তর না পেলেও একাই কথা কয়ে যেতে হয়। কথা কইতে কইতে তিনি সাড়া দেন। বলতে হয় ঃ —এস হরি, এস দয়াময়, আমার হৃদয় নিকুঞ্জে একবার এস। একবার বাঁশি বাজাও, আমি তোমার বাঁশির গানে কুল মানে জলাঞ্জলি দিয়ে তোমার দিকে ছুটে যাই! হে হরে! হে মুকুন্দ মুরারে! তোমার কৃপা ব্যতীত আমার আর কোন উপায় নাই।

তাঁর 'ব্রজনাথ গাথা' থেকেও কিছু পাঠ করলেন ঃ —যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত ইত্যাদি। এরপর প্রার্থনা, প্রণাম, নামমহিমা সংকীর্ত্তন, আরতি, ভোগ এবং পুনরায় সংকীর্ত্তন এইরূপে রাত্রি ১২টা পর্যন্ত চললো।

১লা আশ্বিন ঃ আজও মহিমা সংকীর্ত্তন করে দিনারম্ভ হল। আজ ধীরানন্দদা ও শ্রীশ্রীমোহনানন্দের খুল্লতাত শ্যামানন্দ মহারাজ এলেন।

আজ সন্ধ্যার পূর্বে বাবা ভাষণ দিলেন। প্রথমেই লেখকের প্রশ্নের উত্তরে বললেন—আমরা বিষয়কেই ভালবাসি, ভগবানকে ভালবাসি না কেন? কারণ, বিষয় হল আপাত মধুর। তাই বিষয়েই আকৃষ্ট হয়ে মজে যাই। ভগবানকে আমরা দেখতে পাই না; ভালও বাসি না। বিষয় ভুলে ভগবানকে ভালবাসা এটা যখন বুঝতে পারবো তখন আর বিরহ জ্বালা হবে না। ভগবান অর্জ্জুনকে বলেছিলেন যে লোকে ইন্দ্রাদি দেবতাকে পূজা করলেও সে পূজা আমারই করা হয়; কিন্তু তাহারা আমার উদ্দেশ্যে করে না এ কারণ আমাতে উহা পৌঁছায় না।

পরে ক্ষেপার ঝুলি থেকে 'স্ফূর্ত্তির ফোয়ারা' পাঠ করলেন। ক্ষেপা বললেন স্ফূর্ত্তি আর কতদিন করবে, বড় জোর বছর পাঁচেক? তারপর পেট গেলরে বুক গেলরে বলে ছট্‌ফট্ করবে।

বাবা 'ফুলমালা' থেকেও কিছু পাঠ করলেন। বললেন স্ত্রীলোকের স্বাধীনতা ভাল নয়। উহারা বাল্যে পিতা, যৌবনে স্বামী ও প্রৌঢ়ে পুত্রের অধীন থাকবে। একাকিনী বা অন্য পুরুষের সঙ্গে বাজার হাট সিনেমা প্রভৃতি যাবে না। স্ত্রী অগ্নি, আর পুরুষ ঘৃত, কাছে গেলেই গলে যাবে। এমনকি মা, বোন কিম্বা কন্যার সহিতও পুরুষ একলা থাকবে না। এমনকি গুরুর সঙ্গেও একত্রে একলা থাকবে না। মহামায়ার মায়ার ফাঁদে পড়ে ব্রহ্মা বিষ্ণুও খাবি খান।

এরপর পাঠ করলেন, 'ব্রজনাথ গাথা' থেকে যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত—যখনই অধর্মের ভীষণ অত্যাচারে পৃথিবী উৎপীড়িত হন তখনই আমি সাধুদের রক্ষা ও দুষ্টের নিধনের জন্য যুগে যুগে অবতীর্ণ হই।

পাঠের পর প্রার্থনা, মৌন, প্রণাম ও নামমহিমা সংকীর্ত্তন তারপর আরতি ভোগ ও প্রসাদ গ্রহণের পর পুনরায় নামমহিমা সংকীর্ত্তন করে তবে বিশ্রাম। এই হল ছেলেদের। বাবার কিন্তু এরপর পত্র সেবা আছে।

২রা আশ্বিন ঃ আজ পরম গুরুদেবের তিরোভাবের দিন। নামনীড়ে প্রভাত হতে নামমহিমা কীর্ত্তন প্রহরে প্রহরে হচ্ছে। আশ্রমে সকালে হোম যাগ হল। নাম নীড় হতে শোভাযাত্রা বের হল। পুরোভাগে পরম গুরুদেবের আলেখ্য সিংহাসনোপরি মাল্যাদিতে ভূষিত। তৎপরে সংকীর্ত্তন দল সর্বপিছনে বালক বালিকাদিগকে মিষ্টান্ন ও নরনারায়ণকে পয়সা বিতরণ করিতে করিতে প্রথমে আশ্রমে যাওয়া গেল। সেখানে গুরুপূজা ও প্রণামের পর ফলপ্রসাদ নিয়ে ওঙ্কারেশ্বর মন্দির ও নৌকাযোগে পরপারে শোভাযাত্রা নিয়ে যাওয়া হয়। আজও ওঙ্কারেশ্বরের সমস্ত পাণ্ডা ব্রাহ্মণদের ভোজন করান হল। আজ বাবার ছেলেদের প্রসাদ পাইতে ৪।৩০ বাজিয়া গেল। এরপর মেয়েরা পাবে।

আজ বাবা প্রথমে 'মহারসায়ন' পাঠ করলেন। বললেন মরণ হলেই ভগবান লাভ হয়। মনের মরণ কি করে হয়? না, প্রণাম ও নাম অভ্যাসে হয়। যা দেখবি সব প্রণাম করবি। আর রাম রাম করবি; তাহলেই মনের মরণ হবে। যা শুনবি, যাতে আকৃষ্ট হবি, যাতে বিরক্ত হবি অবিচারে সকলে রাম রাম জপে দিবি, আর জপতে জপতে প্রণাম করবি।

এরপর বাবা পরম গুরুদেব ভগবান শ্রীশ্রীদাশরথি দেব যোগেশ্বরের জীবনী পাঠ করলেন। বললেন এরকম ভালবাসতে কেউ পারে না; অহেতুক ভালবাসা! বলতে বলতে চোখে জল এসে গেল ও সুর ভঙ্গ হয়ে গেল। বললেন একদিন কোন কাজে ট্রেনে করে কলকাতায় গেছেন এবং যে ট্রেনে ফিরতে বলেছিলেন সেই ট্রেনেই ফিরেছেন; কিন্তু বাড়ী আসতে রাস্তায় কিছু বিলম্ব হয়েছে এতেই তিনি ঘর আর বার করছেন। বাড়ী আসতেই বললেন এত দেরি হল কেন? তোমরা ত' বোঝনা তোমাদের বাহিরে পাঠিয়ে ফিরে না আসা পর্যন্ত আমাদের কত উৎকণ্ঠায় থাকতে হয়। তার উপর ফিরতে দেরি হলে তো আর কথাই নেই।

এরপর 'ব্রজনাথ গাথা' পাঠ করলেন। বললেন ভগবান সব সেজে খেলা করছেন। পাঠের পর রাত্রি ১২টা পর্যন্ত যথারীতি প্রার্থনাদি চলতে লাগল।

আজ কর্ণেল সুজন সিং ও মেজর করম্ সিং মউ হতে সপরিবারে অনেক ফলমূল নিয়ে এলেন। ইন্দোর ও পার্শ্ববর্তী স্থান হতেও ১০।১৫জন ভদ্রলোক এলেন। এদের সকলকে বাবা আজ কৃপা করলেন। ইহারা সকলে অন্নপ্রসাদ নিয়ে অপরাহ্নে ফিরলেন। যাবার পূর্বে বাবা সকলের সঙ্গে পৃথকভাবে নির্জনে তাঁহাদের প্রার্থনা শুনলেন ও প্রীতিবিধান করলেন।

ইহাদিগকে বিদায় দিয়াই বাবা পাঠে বসলেন। পাঠ করলেন। মহারসায়ন। বললেন আমি অহরহ এ নাম রসায়ন পান করতে চাই। আমি নিশ্চয়ই বুঝেছি নাম করলে সর্ব্বার্থ সিদ্ধ হবেই। আমার স্থির সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে—আমার মত ক্ষুদ্র জীবের নাম ভিন্ন অন্য গতি নাই। এ পথ ধরেছি, এ পথে চলেছি, যাতে পথভ্রষ্ট না হই তারজন্য শক্তি প্রার্থনা করতে শিখেছি। তথাপি নামে সর্ব্বক্ষণ ডুবে থাকতে পারি না। হে

প্রাণারাম! কৃপা করে আমায় নামে ডুবিয়ে রাখ।

এরপর পরম গুরুদেবের জীবনী খানিকটা পাঠ করলেন। ও সবশেষে 'ব্রজনাথ গাথা' পাঠ করলেন যথা—

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্।।
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।।

আমার ধর্ম্ম সংস্থাপন জন্য আমি দেহ ধারণ করি। ভগবান শঙ্কর আমার ভাগবত ধর্ম্ম যে ভাবে প্রচার করেছেন সেরূপ আর কেহ করতে পারে নাই। তিনি পঞ্চমুখে অহরহ রাম নাম কীর্ত্তন করে রাম নাম কিভাবে করতে হয় ভক্তগণকে শেখাচ্ছেন। একবার আমাকে বলেছিলেন আমি আপনার নাম জপ করে কৃতার্থ হয়ে ভবানীর সহিত নিরন্তর বাস করি এবং মুমূর্ষুগণের মুক্তির জন্য আপনার রাম নাম পান করি।

পার্ব্বতী মাতাকে বলেছিলেন—দেবী, হে সুন্দর বদনে, সর্ব্ব শাস্ত্রে কথিত হয়েছে রাম নাম পরম তত্ত্ব। যে নাম প্রভাবে আমি সর্ব্বজ্ঞ হয়েছি। রাম নাম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ত্রিজগতের মধ্যে আর কিছু নাই। অজ্ঞানে অথবা জ্ঞানে উচ্চারণ করলে কোটি-জন্মকৃত পাপ তৎক্ষণাৎ নষ্ট হয়। যজ্ঞ দান তপস্যা, তীর্থ অধ্যাত্মবোধ হতে কোটি গুণ পুণ্য সীতা নাম সহিত সেই রাম নাম। এজন্য নারদাদি মুনিগণ সীতারাম নাম জপ করেন। যতক্ষণ সীতারাম নামজপ করা না হয় ততক্ষণ রামনাম ফল সার্থক হয় না। সীতার সহিত রাম নাম উচ্চারিত হলেই নাম অপরাধ শূন্য হয়ে যায়।

৪ঠা আশ্বিন ঃ আজ বাবা সকলকে ঘুম থেকে তুলে নামমহিমা সংকীর্ত্তন করালেন। একেই বলে অহেতুক কৃপা। তিনি নাম বিলাতে এসেছেন। নে'বো না বললে চলবে না, তিনি গুঁজে গুঁজে দেবেন। শত কাজের মধ্যেও তিনি প্রহরে প্রহরে নামমহিমা সংকীর্ত্তন করিয়ে যাচ্ছেন।

আজও বাংলা ও ইন্দোর হতে কতিপয় ভাই বোন এলেন। আজ গনুদা ধীরানন্দদা প্রভৃতি কয়েকজন বৃন্দাবন রওনা হলেন।

আজ বাবা পাঠ করলেন ক্ষেপার ঝুলি থেকে দ্বার ও পথ। ক্ষেপা বললেন নরকের বড় বড় তিনটা দরজা আছে। সেই তিনটা দ্বারের নাম কাম, ক্রোধ ও লোভ। এগুলো ত্যাগ করবার উপায় ঃ —সংকল্প ত্যাগ করলেই কাম মরে যায়। কাম মরলেই ক্রোধ থাকবে না। আর সকল বস্তুর অসারতা চিন্তা করলে লোভ থাকে না। শাস্ত্র পথ অবলম্বন করলে লোভ খুব সহজে নষ্ট করা যায়। হ্যাঁ, আর একটা দ্বারের কথা ভগবান শঙ্করাচার্য্য বলেছেন দ্বারং কিমেতৎ নরকস্য নারী—কি এক নরকদ্বার রমণী রতন। যতক্ষণ নারীতে আসক্তি থাকবে ততক্ষণ নরকে যাবার জন্য প্রস্তুত থাক। যতদিন মাতৃজাতিকে মাতৃ মূর্ত্তিতে না দেখিবে ততদিন নিস্তার নাই।

স্বর্গের দ্বার তেমনি সাতটা—তপ, দান, শম, দম, হ্রী, সরলতা ও সর্বভূতে দয়া।

মোক্ষের পথ তিনটি—কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ।

মোক্ষের পথ—নিঃসহ। এই দ্বারের চারিজন দ্বারপাল—শম, বিচার, সন্তোষ ও সাধুসঙ্গ।

কলিতে জীবের জন্য সহজ সরল পথ নাম সংকীর্ত্তন।

এরপর মাতৃপূজা থেকে পাঠ করলেন সীতা ও সাবিত্রী।

রাবণ বধের পর রাম যখন সীতাকে পরিত্যাগ করলেন, তখন সীতা লক্ষ্মণকে চিতা প্রস্তুত করিতে বললেন। চিতা সজ্জিত হল, মা আমার দেবতা ও ব্রাহ্মণগণকে প্রণামপূর্বক কৃতাঞ্জলিপুটে অগ্নির সমীপে বললেন—যেহেতু আমার হৃদয় নিরন্তর রাঘব হইতে বিচলিত হয় না, তজ্জন্য লোক সাক্ষী পাবক আমাকে সকল দিকে রক্ষা কর। চিতায় প্রবেশ করিলে মূর্ত্তিমান অগ্নিদেব সীতাকে ক্রোড়ে গ্রহণ করত উত্থিত হয়ে রামকে সীতা প্রদান পূর্বক বললেন—হে রাম! এই তোমার বৈদেহীকে গ্রহণ কর। ইহার কিছু মাত্র পাপ

নাই। এই সীতা বাক্য, মন, চক্ষু ও বুদ্ধি দ্বারা তোমাকে অতিক্রম করে নি।

পুনরায় যখন জনাপবাদে ত্যাগ করলেন তখনও মা আমার রামের প্রতি কোনরূপ দোষারোপ করেন নি। মা আমার বাল্মীকি মুনির তপোবনে রামনাম জপ, রাম চরণ ধ্যান পূর্বক অবস্থান করতে লাগলেন। পুনরায় যখন শপথ করার জন্য সভায় আনীত হলেন, তখন বললেন—যেহেতু আমি মনের দ্বারাও রাম ভিন্ন অন্য কারও চিন্তা করি নাই তজ্জন্য হে ভূদেবী! আমায় বিবর দান করুন। মাতার আমার প্রার্থনার সঙ্গে সঙ্গে ভূমিতল বিদীর্ণ হল, ধরণী দেবী সীতাকে বাহুদ্বয় দ্বারা গ্রহণ পূর্বক আয় মা আমার বক্ষে আয় বলে বক্ষে ধারণ করত দেখিতে দেখিতে অন্তর্হিতা হলেন।

সাবিত্রীর উপাখ্যান পাঠ করে বললেন সাবিত্রী দেবর্ষি নারদের কথা বিস্মৃতা হন নি; তিনি দিন গুণ ছিলেন। ক্রমে যেদিন সত্যবানের মৃত্যু নিশ্চিত সেইদিন নিকটবর্ত্তী হল। আর মাত্র চারদিন বাকি। সাবিত্রী তিনদিন উপবাস করে চতুর্থদিন সত্যবানকে একাকী বনে যেতে না দিয়ে তিনি সঙ্গে গেলেন। সত্যবান প্রথমে ফল সংগ্রহ পূর্ব্বক কাঠ কাটতে লাগলেন। সহসা সত্যবান কাঠ কাটবার পরিশ্রমে ক্লান্ত হয়ে পড়লেন এবং সাবিত্রীকে বললেন প্রিয়ে, আজ পরিশ্রমের জন্য আমার শরীর ভেঙ্গে পড়ছে। আমি আর দাঁড়াতে পাচ্ছি না। এই বলে সাবিত্রীর কোলে মাথা রেখে শুয়ে পড়লেন ও জ্ঞানশূন্য হলেন। সাবিত্রী নারদ কথিত সময় উপস্থিত জানিয়া একাগ্রচিত্তে শ্রীভগবানকে স্মরণ করিতে লাগলেন। এমন সময় সাবিত্রী দেখলেন সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী এক দিব্য পুরুষ সত্যবানের অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ সূক্ষ্ম শরীরধারী জীবাত্মাকে পাশে বদ্ধ করে দক্ষিণ দিকে যাচ্ছেন। সাবিত্রীও তাঁর পশ্চাৎ পশ্চাৎ চললেন। যমরাজ সাবিত্রীকে দেখে বললেন সাবিত্রী তুমি ফিরে যাও। সাবিত্রী বললেন আমার পতি দেবতা যেখানে যাবেন আমিও সেখানে যাব। এইভাবে পাঁচবার সাবিত্রীকে ফিরিয়া যাইতে বলেন। সাবিত্রীও যুক্তিপূর্ণ বাক্যে যমরাজকে প্রসন্ন করত পাঁচটি বর প্রার্থনা করে নিলেন। প্রথম বরে তাঁর শ্বশুর চক্ষু, দ্বিতীয় বরে অপহৃত রাজ্য ও তৃতীয় বরে তাঁর পিতা একশত পুত্র লাভ করলেন। চতুর্থ বরে সাবিত্রী সত্যবানের ঔরসে শতপুত্র লাভ ও পঞ্চম বরে সত্যবানকে জীবিত করালেন। এইরূপে সাবিত্রী অপার সতীত্ব বলে পিতৃকুল শ্বশুর কুল উদ্ধার করলেন।

এরপরে আবার ক্ষেপার ঝুলি থেকে অনুপরমাণুর বিষয় পাঠ করলেন। এরপর 'ব্রজনাথ গাথা' পাঠ করলেন ঃ —আমার ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্যই যুগে যুগে অবতীর্ণ হই। আমার ধর্ম্মবেত্তা প্রজাপতি ব্রহ্মা ও সনৎ কুমার প্রভৃতিকে আরও বলি—দৃশ্য স্থূল জগৎ হতে দৃষ্টি প্রতি নিবৃত্ত করে, বিতৃষ্ণ মনো বাগ্ ব্যাপার রহিত এবং আনন্দাভূতি সম্পন্ন ও নিরীহ নিশ্চেষ্ট হবে। যদি কখনও প্রাণ ধারণের জন্য নিতান্ত আবশ্যক আহারাদি ব্যাপারে সচেষ্ট হয় তা অকিঞ্চিৎকর হলেও ভ্রম বলে গণ্য হবে না। কেউ আজ পর্যন্ত সংস্কাররূপে স্মৃতি থাকাই স্বাভাবিক বলে জানেন। মদ্যপানে অন্ধদৃষ্টি ব্যক্তির যেমন স্বীয় পরিহিত বসন স্খলিত বা কটি লগ্ন আছে কি না তাই এর কোনটাই অনুসন্ধানে আসে না, তদ্রূপ ব্রহ্মানুভব লব্ধ জ্ঞান সিদ্ধ ব্যক্তি ও বিনাশশীল দেহকে আসনে অবস্থিত বা আসন হতে উত্থিত দেখেন না। যে পর্যন্ত প্রারব্ধ কর্ম্ম থাকে দৈবাধীন দেহ ও প্রাণ ধারণ করে জীবিত থাকে; কিন্তু সমাধি যোগে আরূঢ় হয়ে স্বপ্নতুল্য দেহের ভজনা করবে না। এই আমি আত্মনাত্মা বিবেক ও অষ্টাঙ্গ যোগ বিষয়ক যে গুপ্ত ধর্ম্ম তা বললাম। হে বিপ্রগণ তোমাদের জিজ্ঞাসিত ধর্ম্ম বলবার জন্যই আমি এসেছি।

ক্রমশঃ

ভক্তের ভগবান

বা রী ন্দ্র কু মা র চ ট্টো পা ধ্যা য়

(২)

সকাল ৮টা নাগাদ বাবা সদলবলে বিঠুর রওয়ানা হইয়া যাওয়ার আগে রন্ধনশালায় প্রণাম করিয়া গেলেন এবং আমরাও নিশ্চিন্ত হইলাম। কানপুরের চারিদিক হইতে আমাদের গুরুভ্রাতা ভগিনীগণ পুত্রকন্যাসহ আসিতে আরম্ভ করিলেন। শ্রীশ্রীনামকীর্ত্তন মাইকযোগে সমানভাবে চলিতে লাগিল। গুরুগত প্রাণ সোদরসম শ্রীসুবোধ মিত্র তখন ভোগ রান্নার ব্যবস্থাপনায় রীতিমত ব্যতিব্যস্ত। ব্যায়ামশালা উৎসবক্ষেত্রে পরিণত হইয়া গেল। বাবার আবার একটি দাঁতের যন্ত্রণা হইতেছিল—বিঠুর হইতে ফিরিবার সময়ে শ্রদ্ধেয় শ্রীঅরুণোদয় ঘোষদা তাঁহাকে দাঁতের ডাক্তারের নিকট লইয়া গিয়া সেটিকে উৎপাটন করাইয়া আনিলেন। বাবা আশ্রম হইতে ফিরিলেন তখন প্রায় বেলা ১টা। তাহার পর প্রণামের পালা চলিল। ইতিমধ্যে ৪০।৪৫জন দীক্ষার্থী আসন পাতিয়া বসিয়া আছে, বাবা তাহাদের দীক্ষা দিয়া নবজীবন দান করিলেন। সন্ধ্যায় সামান্য অসুস্থতার জন্য আর ভাষণ দেওয়া সম্ভব হইল না।

শীত সেদিন রাত্রে আর ছিল না বলিলেই চলে। শ্রীসচ্চিদানন্দজীকে বলিলাম 'দেখুন বাবার কি মহিমা। গতকাল বৃষ্টি হইয়াছে—শেষ রাত্রে যখন আপনারা আসিলেন তখন কি রকম শীত অথচ এখন শীত একেবারেই নাই।'

রাত্র তখন ৯টা হবে, দয়াল ঠাকুর আবার তাঁহার ঘরের দরজা খুলিলেন। অনেকেই তাঁহার দর্শনের আশায় অপেক্ষা করিতেছিলেন। একে একে তাঁহারা প্রণাম করিতে লাগিলেন। বাবাও অকাতরে তাঁহার অযাচিত আশীর্বাদ বিতরণ করিতে লাগিলেন---আমরা এক মহা আনন্দ সাগরে ভাসমান অবস্থায় তাঁহার লীলা প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলাম আর ভাবিতে লাগিলাম আমাদের কত সৌভাগ্য।

আজ এক বৎসর পরে ভক্তের ভগবান আমাদের উদ্ধার করিতে আজ এখানে উপস্থিত হইয়াছেন—এই ব্যায়ামশালায়। রাত তখন ১০টা, বাহিরের লোকজনও সব চলিয়া গিয়াছে—নতজানু হইয়া যুক্ত করে বলিলাম 'বাবা আমাদের কত অপরাধ হয়েছে, আমাদের মার্জনা করুন।' বাবা হুঙ্কার দিয়া বলিলেন 'কি অপরাধ করেছিস্?'

উত্তরে বলিলাম 'আপনাকে সেবা করি এমন সাধ্য আমাদের কোথায়? অজ্ঞতাবশতঃ কত সেবা অপরাধ হয়েছে।'

সর্ব্বভূতে অভয় দেওয়া তো তাঁহার নিত্য কাজ তাই বলিলেন যে 'না না, কোনও অপরাধ হয়নি।' এবং আবার একটি মালাও পরিয়ে দিলেন। কৃত-কৃতার্থ হয়ে গেলাম, মানব জনম সফল হয়ে গেল। সারাদিন পরিশ্রমে ক্লান্ত অপটু শরীর রাত্রের বিশ্রামের জন্য বিদায় চাওয়াতে তিনি চিবুকে হাত দিয়ে বলিলেন 'আবার কখন দেখা পাব?'

আনন্দাশ্রুতে চোখ ভরে গেল, কণ্ঠরুদ্ধ হইয়া গেল। শ্রীপাদপদ্ম দুটি বুকে জড়িয়ে ধরে বললাম—'ওগো কৃপার সাগর! তোমার এত করুণা এই অধম সন্তানের উপর। আমি যে জন্ম জন্ম ধরে তোমার রাতুল চরণ দুটির স্পর্শ পাব বলে বসে আছি, আমি তোমার দর্শন পাব?' তিনি সহাস্যে বলিলেন 'কাল সকালে আমাকে ট্রেনে উঠিয়ে দিস্।' চোখের জল মুছে বাসায় ফিরে

এলাম। এবং ১৭ই ডিসেম্বর ৫টার সময় শয্যা ত্যাগ করে প্রস্তুত হয়ে আবার ব্যায়ামশালায় উপস্থিত হলাম। সবে তখন রাত যাইতেছে দিন আসিতেছে। সেই মাহেন্দ্রক্ষণে গঙ্গার ধারে বাবার ঘরের সামনে গিয়ে দেখি তিনি ধ্যানস্থ হয়ে বসে আছেন।

বাহির থেকেই ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম জানালাম। আর অনিমেষ নয়নে সেই মধুর মুরতি দর্শন করিতে লাগিলাম। বুকখানা ভরিয়া গেল, চোখ সার্থক হইল।

ধ্যানানন্দ দাদা ভোরে মঙ্গল আরতি আরম্ভ করিলেন---আমরাও তাহাতে যোগ দিয়া ধন্য হইলাম। আরতি অন্তে প্রণাম করিয়া বাহিরে আসিয়া বাবার স্টেশনে যাওয়ার ব্যবস্থা করিতে লাগিলাম। একটু পরে অক্লান্ত কর্মী শ্রীসুবোধ মিত্র নাচিতে নাচিতে আসিয়া বলিল যে, বাবা তাহার নামকরণ করিলেন ''উপানন্দ।'' তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিয়া ভয়ে আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলাম। সময় যতই নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল মনটা বিদায় বেদনায় ক্রমশঃই ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিতে লাগিল। শ্রীভৌমিক মহাশয় বাবাকে লইয়া যাওয়ার জন্য তাঁহার মোটরখানি সকালে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। হরিরলুট সহযোগে বাবাকে সেই গাড়ীতে বসাইয়া ও আর একটি বাসে আর সকলে আরোহণ করিলে শ্রীশ্রীনাম সহযোগে স্টেশনে যাত্রা করিলাম। যথাসময়ে ভক্তের ভগবান আমাদের চোখের জলে ভাসাইয়া কানপুর ত্যাগ করিলেন। ''জয়গুরু'' শব্দে আকাশ-বাতাস মুখরিত হইয়া উঠিল, কাঁদিতে কাঁদিতে বাসায় ফিরিয়া আসিলাম। সবশেষে আপনার শিখান ভাষায় জোড় হস্তে নতজানু হইয়া বলি—

অপরাধসহস্রভাজনং
পতিতং ভীম ভবার্ণবোদরে
অগতিং শরণাগতং গুরো
কৃপয়া কেবল আত্মসাৎ কুরু।।

স্টেশনে দয়াল ঠাকুর আমার শ্রীসুবোধ মিত্রকে বলিলেন যে, তিনি এবার ব্যায়ামশালায় আসিয়া তিনদিন যজ্ঞ করিবেন। ওগো ভগবান! তোমার সে লীলা দেখিবার জন্য আমরা উদ্‌গ্রীব, কবে সে শুভদিন আসিবে? তুমি আমাদের শক্তি দাও, প্রেরণা দাও। তোমার কৃপা বারিতে স্নাত হইয়া আমরা যেন তোমার অভিলষিত কাজ সুসম্পন্ন করিতে পারি। জয়গুরু

সমাপ্ত

মিলন যজ্ঞে

পুরঞ্জয় রায় বন্দ্যোপাধ্যায়

(২)

পরদিন (শনিবার) বেলা প্রায় ১০টা নাগাদ পাঠ সমাপ্ত হলো। আমরা সেবানন্দর হাতে বইটির পাণ্ডুলিপি প্রত্যার্পণ করে ঠাকুরকে জানিয়ে এলুম। তারকদা বিদায় নিলেন। আমাকে প্রশ্ন করলেন—কখন যাবি?

বৈকালের দিকে।

ওঃ! পূর্ণাহুতির পর।

আজ যজ্ঞের শেষ দিন।

ঠাকুর তাঁর কর্ম্মসূচীর সমরে নেমে পড়লেন।

সহস্র সহস্র শিষ্যের প্রণাম গ্রহণ ও মন্ত্রদান পর্ব।

দিনের পর দিন মাসের পর মাস এই আনুষ্ঠানিক পর্ব্ব চলছে, চলবে। অবিশ্বাস্য পরিশ্রম। বিশ্রামহীন জিতনিদ্র অনলস মহাকর্মীর কর্ম্মযোগ! আমাদের দুর্বল দেহ, দুর্বল মন।

সর্ব্বদাই আশঙ্কা, যদি এ গুরু পরিশ্রম শরীর না সহ্য করে।

গত রাত্রে এ নিয়ে অনুযোগও করে ফেলেছিলুম।

একটু হেসে প্রতি প্রশ্ন করে বলেছিলেন ঠাকুর, দেখ ত তাকিয়ে, কোন ক্লান্তির ছাপ আছে কি মুখে?

পরমাশ্চর্য্যের সঙ্গে তাকিয়ে দেখলুম সত্যিই সেখানে তখন কোন ক্লান্তির ছাপ নেই, চুপ করে গেলুম।

যজ্ঞমঞ্চে বসে আছি।

পরের স্কন্ধে ভর দিয়ে এলেন মামুদপুরের জয়ন্ত দা!

'শঙ্কর দীনবন্ধু জয়ন্ত শৈল' চারটি নাম ঠাকুর প্রায় এক সঙ্গেই উচ্চারণ করেন। ঠাকুর স্নেহ পারাবারে ওঁদের সন্তরণটা অহরহ লক্ষীভূত হয়।

অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে জয়ন্ত দা বললেন—ঠাকুরের অশেষ কৃপা! শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছিলুম প্রায় একমাস! স্বেচ্ছায় এলেন ঠাকুর তিনদিন আগে, কৃপা করেন বলেই! স্পর্শ দিলেন, ক্রিয়া দিলেন। এ যজ্ঞে আজ উপস্থিত হতে পারবো এ কল্পনা করিনি। কিন্তু তাইতো হলো!

এঁরা ব্রজের রাখাল! ব্রজেশ্বর এঁদের বুকে করে রেখেছেন।

এ যজ্ঞে এসেছিল কত ভক্ত কত শিষ্য। কত নাম করবো! যজ্ঞ সেবক সংখ্যাও অল্প নয়! অনেকদিন পরে তারাশঙ্করদা, মনোজদা ও প্রমোদদা প্রভৃতি অধ্যাপকবৃন্দকে পেয়ে বড় আনন্দ হল।

সুবিখ্যাত চিকিৎসক শ্রীশ্রীঠাকুরের পরম ভক্ত শ্রীনলিনীরঞ্জন সেনগুপ্ত মহাশয়কে একদিন দেখলুম। একদিন দেখি মন্ত্রী তরুণকান্তি ও চিন্ময়ানন্দস্বামী এসেছেন।

আজই যজ্ঞের শেষ দিন।

পূর্ণাহুতি সময় আসন্ন হয়ে এলো।

বৈদিক মন্ত্রে সমগ্র যজ্ঞস্থল মুখর হয়ে উঠলো।

অগণিত নরনারী রুদ্ধ নিঃশ্বাসে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

আচার্য শঙ্কর পূর্ণাহুতি দিলেন।

একে একে তখন অনেকেই শেষ আহুতি দিলেন।

বিরক্ত ভায়েরা যজ্ঞস্থল পরিক্রমা করে গেলেন।

দিব্য অনুষ্ঠান সমাপ্ত হলো।

এক অনাস্বাদিত পুলকে সমগ্র দেহ মন ভরিত হয়ে উঠলো।

সমাপ্ত